শক্তিবাদ

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
জানুয়ারী ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ :
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা "আর্ষপ্রয়োগ" হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত "আর্ষপ্রয়োগ" আর কোন্‌টা বা "প্রেসের ভূত"। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় "প্রকাশকের নিবেদন" বলে প্রকাশ করেছি। "প্রকাশকের নিবেদন" বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

শক্তিবাদ কি ?

১। কেন্দ্রীয় শাসন (গভর্ণমেণ্ট) এমন এক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন যে নীতির লক্ষ্য হইবে প্রত্যেক স্তরের মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিকাশমুখী গতিকে অগ্রসর করিয়া দিবার অনুকূল হওয়া এবং সর্ব্বস্তরের মানুষের বিকাশবিরুদ্ধ যে কোন ব্যক্তিগত ও সমাজগত আচরণের প্রতিকূল হওয়া এবং যে শাসন নীতি এমন কোন অনীতির প্রশ্রয় দেয় না যাহাতে কোনও স্তরের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও কর্ম্ম সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে উহা শক্তিবাদ। শক্তিবাদকে পূর্ণ বিকাশবাদ নাম দেওয়া যায়।

২। যাহারা শাসন নীতিকে ঐ ভাবে পরিচালিত করিবার জন্য, গঠিত করিবার জন্য এবং ঐ দিকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করে তাহারা শক্তিবাদী। শক্তিবাদী পূর্ণ বিকাশবাদী।

৩। শক্তিবাদীগণ অন্যায় বিরোধী এবং আসুরিক বিরোধী মনোবৃত্তিতে আপনাদিগকে গঠন করিবে এবং অভয়, সত্য, প্রেম ও শান্তির অবলম্বন করিবে।

৪। ভীরুগণ শক্তিবাদ গ্রহণ করিতে পারে না, কাজেই শক্তিবাদে ভীরুতার স্থান নাই। গুণ্ডামি ও আসুরিকতা করিতে যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায় ও শক্তিবাদীর উহা লক্ষ্য নহে। সে বরং উহার বিরোধিতায় সৎসাহস অর্জ্জন করিবে।

৫। **সত্য** - সত্যের প্রচারই সত্য, মিথ্যা কথা কল্পনা করিয়া প্রচার করা আসুরিক কর্ম্মনীতির লক্ষণ। যাহাদের কর্ম্মনীতিতে মানুষের মনোজগতের স্বাভাবিক নৈতিক সমর্থন নাই তাহারা মিথ্যা প্রচার দ্বারা নিজের অনীতিকে নিজের দলের লোক দ্বারা সমর্থন করাইবার জন্য মিথ্যা প্রচার করিতে বাধ্য হয়। শক্তিবাদীরা ঐরূপ করিবে না। কারণ মানুষের নৈতিক সমর্থনের ভিত্তিতে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত।

৬। **প্রেম** - বিদ্বেষ হীনতাই প্রেম (গীতার অহিংসা)। শক্তিবাদীরা কোন সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম ও ব্যক্তিকে বিদ্বেষ না করিবার নীতি মানিয়া লইয়া গুণ্ডামি ও আসুরিকতাকে প্রশ্রয় দিবে না এবং এই নীতির গতি বুঝিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য একটু কঠোর নীতির অনুসরণ করিবে। গুণ্ডামি বা আসুরিকতার মূলে কোন সমাজের গুপ্ত বা প্রকাশ্য সমর্থন না থাকিলে প্রচার দ্বারা সমাজের ঘৃণা জাগাইয়া এই অনীতির প্রতিকার করা যায়, কিন্তু

সমাজ বিশেষের ইহাতে সমর্থন থাকিলে শুধু প্রচার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবে না। সেখানে কঠোর নীতির আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন। যে সব সমাজে এইরূপ অনীতির সমর্থন বুঝা যায় শক্তিবাদীগণ কোনওপ্রকার বিপদেই ঐ সমাজের অঙ্গীভূত কাহাকেও সাহায্য করিবে না। অধিক কি উক্ত সমাজের একটি ভিক্ষুককে পর্য্যন্ত ভিক্ষা দ্বারা সাহায্য করিবে না।

৭। **শান্তি** - নিজ নিজ বিশ্বাসানুসারে উপাসনার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। উপাসনার অনুষ্ঠান সব ধর্ম্মেরই জাঁকজমকহীন ও শান্তি লাভের অনুকূল। শক্তিবাদের ইহাই শান্তি। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মের নানা প্রকার নৈমিত্তিক ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান আছে। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানকে সামনে রাখিয়া কতকগুলি অকারণ গুণ্ডামি এবং অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি করিলে উহাকে গুণ্ডামি বলিয়া মানা হইবে।

৮। **আস্থরিকতা** - যে শাসন নীতির প্রভাবে, উস্কানিতে বা দুর্ব্বলতায় মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিকাশ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তিগত অনাচার বা গুণ্ডামী, সমাজগত অনাচার বা গুণ্ডামি অথবা শ্রেণীগত অনাচার বা শ্রেণীগত গুণ্ডামি প্রশ্রয় পায় এবং যে শাসন নীতির অদূরদর্শিতায় মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও কর্ম্ম সমস্যার উদ্ভব হয়, উহা আস্থরিক শাসন। উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিলে আস্থরিক শাসন উহার প্রতিকার না করিয়া প্রতিকারেচ্ছু সমাজের উপর পীড়ন নীতি চালাইতে থাকে।

৯। বিকাশের জন্য মানুষ আপন সমাজে শিক্ষাবিভাগ, বিচারবিভাগ, সমাজবিভাগ, ধর্ম্মবিভাগ, শাসনবিভাগ ও সৈন্যবিভাগের স্থাপনা করিয়াছে। ইহার যে কোন বিভাগ মানুষের বিকাশে সাহায্য না করিয়া বিকাশে বাধা দিবার কোনও প্রকার নীতির সৃষ্টি করিলে উহা আস্থরিকতা বলিয়া জানিতে হইবে। আস্থরিক শাসনেই বিকাশপথে বাধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। নারী নির্য্যাতন, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার প্রভাব ও শান্তিনিষ্ঠ প্রতিবেশী সমাজের উপর অন্য সমাজের ক্রমাগত আক্রমণ এইসব কেন্দ্রীয় নীতিতে আস্থরিক বা দুর্ব্বল মনোবৃত্তির লক্ষণ।

১০। আস্থরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ, সমাজ, দেশ বা শ্রেণী সুবিধা হাতে পাইলে অন্য মানুষ, অন্য সমাজ, অন্য দেশ ও অন্য শ্রেণীর উপর বিকাশ বিরুদ্ধ নীতির প্রতিষ্ঠায় যত্নশীল হইয়া থাকে। ঐ জন্য ঐরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির শাসন নীতি অত্যন্ত অনীতির শাসন হইয়া থাকে। এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগে নির্ব্বাচন প্রার্থিগণের কতকগুলি বিশেষ সৎগুণ থাকা প্রয়োজন। সে সৎগুণগুলি শক্তি স্তরের নীতির অনুকূল না হইলে তাহার পরিচালিত শাসন নীতি কখনও সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর বিকাশানুকূল হইতে পারে না। যাহাতে নির্ব্বাচিত সদস্য শক্তিস্তরের নীতি ধরিয়া চলিতে বাধ্য হয় সেজন্য যথেষ্ট আইনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শাসনে অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয়

পাওয়া গেলে যে কোন শাসকের উপর উহা প্রয়োগ করা চলিবে। যে অনীতির প্রতিকারের জন্য রাজশাসনের যুগকে ভাঙ্গিয়া প্রজাশাসনের যুগে পরিণত করা হইয়াছিল সে অনীতির কঠোর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার ও শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি পদে উন্নত মস্তিষ্ক ও মেধা সম্পন্ন লোকের নিযুক্ত হওয়ার নীতি প্রবর্ত্তন না করিলে জনশিক্ষা ও জনরক্ষা বিভাগের কার্য্য বিকাশ প্রতিকূল হওয়া স্বাভাবিক। ইহা আসুরিক নীতির পরিচায়ক।

১১। **দেবাসুর সংগ্রাম** - কেন্দ্রীয় শাসন নীতির সদিচ্ছা থাকিলে সর্ব্বস্তরের বিকাশানুকূল কর্ম্মবিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় নীতির সংশোধন সহজ হইবে। যাহাতে সমাজে নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নারীর পিছনে কেন্দ্রীয় শক্তির এতটা শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকিবে যে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একজন নারী একা বিচরণ করিতে থাকিলেও কোথাও তাহার উপর অমর্য্যাদার ব্যবহার করিতে কেহই সাহস পাইবে না। দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা করিয়া উহার ব্যবস্থা দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অন্ন, বস্ত্র ও দুগ্ধ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যাহাতে সুলভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিকাশবাদের অনুকূল করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক খণ্ড সমাজ বা সম্প্রদায়কে শক্তিবাদের বিকাশ ভিত্তির উপর সংগঠিত হইবার জন্য স্বাধীনতা দিতে হইবে। আবার যাহাতে কোন সমাজই আসুরিক মনোবৃত্তিতে গঠিত হইবার সুযোগ না পায় সেজন্য কঠোর আইন প্রস্তুত করিতে হইবে। যদি সহজে শক্তিবাদীরা এইসব নীতি কেন্দ্রীয় শাসন বিজ্ঞানে ধরাইতে না পারে তবে উহার ফলে সমাজে দেবাসুর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সূত্রপাত হইবে।

১২। কেন্দ্রীয় নীতির যদি আসুরিক লক্ষ্য হয় তবে অন্যায়কারিগণ ইহাদের সমর্থনেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। কাজেই সর্ব্বপ্রকার অনীতির বিরোধিতার উপর আন্দোলন ও সংগঠন দাঁড় করাইয়া শক্তিবাদীগণকে অগ্রসর হইতে হইবে। অনাচারকারীদের অনাচার প্রতিরোধে অগ্রসর হইলে, অনাচারের মূলস্থ কেন্দ্রীয় আসুরিক নীতির সহিত সংঘর্ষ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আসিবে। মানুষ মাত্রই নীতি ও অনীতি বুঝিবার শক্তি রাখে। সুতরাং যদি উপযুক্ত বাধা পায় তবে আসুরিক চিন্তা প্রভাবে দিক্‌ভ্রান্তগণের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে থাকিবে। শক্তিবাদীগণ এই অনীতির বিরোধিতা না করিলে এই অনীতির সমর্থন দিন দিন বৃদ্ধিই হইতে থাকিবে। কেন্দ্রীয় নীতিও সম্মান এবং পদমর্য্যাদা দানে এই অনীতির সমর্থকগণকে দৃঢ়মূল করিয়া দিবে। অনেক অল্প বিকশিত চিন্তার কর্ম্মনীতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মীরই এইরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব যে কেন্দ্রীয় নীতির সহিত বিরোধিতা করিতে যাইয়া সমাজের মধ্যস্থিত এই অনাচারী দিগকে জড়াইলে লক্ষ্য দূরবর্ত্তী হইবে ; কিন্তু শক্তিবাদী গণ এইরূপ ভাবপ্রবণ কর্ম্মীগণকে দুর্ব্বল কর্ম্মী বলিয়া জানিবে। ইঁহারা যতবড় নামী পুরুষই হউন না কেন শক্তিবাদীরা ইঁহাদের কথায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

১৩। **কর্ম্মবিজ্ঞান** - যাঁহারা শক্তিবাদের কর্ম্মবিজ্ঞান বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন তাঁহারা আমাদের মূলগ্রন্থ (ক্রম বিকাশের পথে) পাঠ করুন। তাহাতে মানুষের মনোবিকাশের কোন স্তর হইতে কিরূপ চরিত্র সম্পন্ন মানুষ আসে এবং কোন স্তর হইতে মানব সভ্যতার কোন কোন বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার আলোচনা হইয়াছে। বিচার বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, সমাজবিভাগ, ধর্ম্মবিভাগ ও শাসনবিভাগের মূলে যে মানুষের মনো-বিজ্ঞানের সম্বন্ধজড়িত নীতি আছে উহা বুঝিতে পারিলে কর্ম্মীদের কর্ম্মপন্থা সহজ হইবে। প্রত্যেক শক্তিবাদী উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। উহাতে বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তরকে শক্তিস্তর নাম দেওয়া হইয়াছে। এই স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আমাদের এই শক্তিবাদ লিখিত। ইহা ষোল কলা বিকাশের ক্ষেত্র। জীব-জগত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিকাশ সম্পন্ন মানুষে এই ষোল কলা বিভাগে কাহার স্থান কোথায় উহার বিস্তারিত আলোচনা পাঠকগণ গ্রন্থে জানিবেন। এক কলায় উদ্ভিদ্ জগৎ, দুই কলায় স্বেদজ, তিন কলায় অণ্ডজ, চার কলায় জরায়ুজ। মানুষও জরায়ুজ কলার জীব। নিম্ন স্তরের মনোবিকাশ সম্পন্ন মানুষ ও উন্নত স্তরের পশুতে ভেদ খুবই কম।

১৪। মনোবিকাশের পাঁচ কলার (৪৷৷০ হইতে অনূর্দ্ধ্ব ৫৷৷০ পর্য্যন্ত পাঁচকলা, ৫৷৷০ হইতে অনূর্দ্ধ্ব ৬৷৷০ পর্য্যন্ত ৬ কলা ; এইরূপ বিভাগ ধরিবেন) স্তর হইতে বিচার বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। স্থাপত্যবিজ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞানবিভাগ এই স্তর হইতেই আসিয়াছে। এই স্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ অন্যায়বিরোধী, ত্যাগনিষ্ঠ, যুদ্ধপ্রিয়, উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন, একটু একগুঁয়ে, স্বদেশপ্রেমিক, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়ভাষী, সাহসী ও জড়বিজ্ঞানে নিষ্ঠাসম্পন্ন হন। ইঁহারা অন্ধবিশ্বাসী হন না। বিচারক, ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার ও যুবকগণের নেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ স্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যাইবে। ইঁহারা অন্যায়ের প্রতিবিধানে একটু কঠোর হৃদয় হন।

১৫। পাঁচ কলার চিন্তার স্তর হইতে যে সব দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে সেগুলি নাস্তিক দর্শন। জড় বিজ্ঞানকে প্রধান ভিত্তি করিয়া ইঁহাদের দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত না হইলে ইঁহাদিগকে উহা মানানো যায় না। ইঁহারা বিশ্বাসবাদ পছন্দ করেন না। এ স্তরের চিন্তার ভিত্তিতে বর্ত্তমান যুগের ধনসাম্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এ স্তরের চিন্তাবিজ্ঞানে বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠিত। এ স্তরের চিন্তার যাহা দার্শনিক ভিত্তি তাহাতে যে সব কর্ম্মবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র হইয়াছে সেগুলি এ স্তরের বিকাশসম্পন্নগণের প্রিয় হইয়া থাকে। পাঠক একথা মনে রাখিবেন, যে, মানুষের সমাজে অন্ততঃ সাত কলার বিকাশ সম্পন্ন চিন্তা বিজ্ঞান না হইলে উহা কার্য্যে পরিণত করা যায় না। যাহা হউক এ স্তরের চিন্তাবিজ্ঞানের ভিত্তিতে কমিউনিজম্ স্থাপিত। ভারতের একটা বিরাট অংশ (যুবক) এই স্তরের চিন্তায় নিজেদের চিন্তা ও কর্ম্মবিজ্ঞান নিয়মিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইবে। এ স্তরের চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই

যে ইহা ভাবিতে বেশ লাগে, কিন্তু অল্প বিকশিত চিন্তার বিজ্ঞানে নিয়মিত কর্ম্মবিজ্ঞান বলিয়া ইহা সমাজে চালান যায় না। এই স্তরের চিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই যে এই স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞানে কেবল যুদ্ধ করাইতেই উৎসাহ দিতে পারে কিন্তু এ বিজ্ঞানে শাসনযন্ত্র চালান যায় না।

১৬। ছয় কলার স্তর হইতে শিক্ষাবিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। চিকিৎসাবিভাগ, প্রচারবিভাগ, যে কোন প্রকারের সমাজ সেবার বিভাগ ও জ্যোতিষী বিভাগ এই স্তরের চিন্তার দান। এই স্তরের মানুষ কোমল স্বভাব, ধীর-মৃদুভাষী, হিসাবীপ্রকৃতি, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী ও ভাবপ্রবণ হন। মেয়েদের মধ্যে এ স্তরের বিকাশ খুব ভাল বিকাশ বুঝিতে হইবে। পুরুষ জাতির মধ্যে এ স্তরের বিকাশ সম্পন্নগণের চেষ্টা, চরিত্র, কথা ও চেহারা একটু মেয়েলি ছাঁচের হইয়া থাকে।

১৭। এই স্তরের দর্শনশাস্ত্র বিশ্বাসবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঁচ কলার দর্শন নাস্তিক দর্শন ; কিন্তু ছয় কলার দর্শনশাস্ত্র বিশ্বাসবাদের দর্শন। আমাদের দেশের বৈষ্ণববাদ, রামকৃষ্ণবাদ, ব্রাহ্ম সমাজের ভগবানবাদ, ইসলামের ঈশ্বর, আর্য্য সমাজীদের ঈশ্বর, খৃষ্টের ভগবান এবং প্রচলিত প্রায় সকল ধর্ম্মের ঈশ্বরই এই স্তরের দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সামাজিক নীতি ও আর্য্য সমাজীদের সামাজিক নীতি এ স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞান ভিত্তিকে অতিক্রম করিয়া সাত কলার কর্ম্মবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়াছে। কর্ম্মবিজ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞানের এইরূপ তারতম্যের কারণ আছে। উহার কারণ এই যে মানুষের জন্মগত চরিত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিকাশের ভিত্তিতে স্বভাবতঃই আসিয়া যায়। তাহার কর্ম্মগুলি ও চরিত্র সেই বিকাশের অনুরূপ চরিত্রে প্রতিভাত হইতে থাকিবে ; কিন্তু অনুভূতির জ্ঞান এই জন্মের সাধনা ও তপস্যার উপর নির্ভর করে। একজন বিকাশে সাত কলার জীব হইলেও তাহার অনুভূতির জ্ঞান যে সাত কলার স্তরের হইবে একথা বলা যায় না। এই জন্মে যে যতটা অনুভূতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, উহা তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে ধরা পড়িবে। আবার সাত কলায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি সহজে ছয় কলার ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া সেরূপ দর্শনের ভিত্তিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদ দাঁড় করাইতে পারেন। যাহা হউক এখানে এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যাঁহার কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য যে কলার তাঁহার পক্ষে সেই স্তর পর্য্যন্ত অনুভূতি লাভ করা সহজসাধ্য। অনুভূতির জ্ঞান যিনি যে কলাতেই থাকুন না কেন - পাঁচ, ছয়, সাত ক্রমেই আসিবে। তবে যাঁহাদের জন্মগত জাতিস্মরত্ব আছে তাঁহাদের অনুভূতিও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। এ সব কথা বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে। ছয় কলার কর্ম্মনীতির উপর বর্ত্তমান গান্ধিবাদী কংগ্রেসের কর্ম্মনীতি ও দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ স্তরের বিকাশ সম্পন্ন ভাববাদীদের নিকট ইহার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু শক্তিবাদীরা এসবে সাবধান থাকিবেন। ইহা দ্বারা সমাজ চলে না এবং আস্থরিক লক্ষ্যসম্পন্ন সমাজ প্রশ্রয় পায়।

১৮। এই স্তরের লোকেদের মধ্যে যাঁহারা একটু প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি পাইয়াছেন তাঁহারা মাঝে মাঝে খুব বড় বাণী দিতে ভালবাসেন। যশোভাগ্য এই স্তরের বিকাশের একটা বৈশিষ্ট্য। তাই এই স্তরের যশস্বীগণের ধারণা যে, ইঁহারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী লোক এবং তাঁহাদের কথার আকাশকুসুম বা হাওয়াই বাণীগুলি দ্বারা একদিন এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। মরণকালেও ইঁহারা কিছু কিছু বাণী দিবার খেয়াল রাখেন। অদূরদর্শী যুবকগণের নিকট দুই এক দিনের জন্য এই সব বাণী খুব ভাল লাগিলেও ইহার দ্বারা সমাজের বিশেষ কোনও উপকার হয় না। কারণ যাঁহারা সমাজের প্রকৃত কর্ম্মী তাঁহারা সাত কলার স্তর হইতে আসেন এবং তাঁহারা ইঁহাদিগকে খুব চিনেন। ইঁহারা যদি জানিতেন যে ইঁহারা বিকাশক্ষেত্রে মাত্র ছয় কলার বিকাশ তবে অন্য কোনও দেশের না হউক আমাদের এই দেশের বিশেষ মঙ্গল হইত। ইঁহারা যশের কাঙাল হইবার দরুণ যশের হাওয়া দেখিয়াও বাণী ছাড়েন। ইঁহারা পাঁচ কলার কর্ম্মধারা ও দার্শনিক জ্ঞানকে কখনও অন্তরের সহিত মানেন না কিন্তু যশের লোভে সুবিধা হইলে নাস্তিক দর্শন ও ধনসাম্যবাদের পক্ষেও বাণী দেন। এই স্তরের লোক যদি শক্তিস্তর বুঝিতে চেষ্টা করেন তবে ইঁহাদের এই স্পর্দ্ধা কিছু কমিতে থাকিবে। ইঁহারা মনে করেন ইঁহারা বেশী উদার কিন্তু শক্তিবাদীগণ ইহা পরিষ্কার মনে রাখিবেন যে, ইঁহাদের উদারতার ভাঁওতায় পড়িলে আসুরিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ দ্বারা অনিষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ছয় কলার যশভিখারিগণ দুর্লভ যশের অভাব হইবে বলিয়া কৌশলে ইহাদের মনোরঞ্জন করিয়া এমন আদর্শের বাণী দিতে থাকিবেন যে উহাকে ভিত্তি করিয়া চলিলে গুণ্ডামীর নিকট আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে।

১৯। মেধাবী ছাত্র, উকিল, মোক্তার, চিকিৎসক, রাজদূত, স্মৃতিধর, দোভাষী, ধর্ম্ম প্রচারক, বক্তা, সংবাদপত্রসেবী, পুরোহিত, গায়ক, কবি, সেবাশ্রম ধর্ম্মী, অহিংসাবাদী, রেলওয়ে কর্ম্মচারি, সরকারী কর্ম্মচারি ও জ্যোতিষীগণের মধ্যে এই স্তরের বিকাশসম্পন্ন মানুষ অধিক পাওয়া যাইবে।

২০। সাত কলার বিকাশ সম্পন্নগণ সমাজ কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ইঁহারা কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, গম্ভীরস্বভাব, চক্রী, মনে ও বাক্যে দুই রকমের, কথা ও কার্য্যে দুই প্রকার ভাবসম্পন্ন হন। ইঁহারা স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধচিত্ত হন ; কিন্তু এই স্তরের লোক কিংবা ইহা হইতে উন্নত স্তরের লোক ভিন্ন অন্য কেহই উহা বুঝিতে পারেন না। সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন ভোগী চরিত্র, মোটেই আদর্শবাদী নহেন।

২১। সাত কলার বিকাশ সম্পন্নগণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) দৈবীসম্পদসম্পন্ন সাত কলার বিকাশ, (২) আসুরিক সম্পদসম্পন্ন সাত কলার বিকাশ।

২২। দৈবীসম্পদসম্পন্নগণ কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, দাতা, উদারচরিত্র, মিষ্ট ও গম্ভীর ভাষী হন। আসুরিক সম্পদসম্পন্নগণ নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক ও সুবিধাবাদী হইয়া থাকেন। গীতার ষোড়শ অধ্যায় পাঠ করুন।

২৩। সমাজ মাত্রেই সাত কলার চরিত্র সম্পন্ন লোকদের অনুরূপ চরিত্র বিশিষ্ট আরও এক প্রকার লোক পাওয়া যায়। তাহারাও আসুরিক কলা বিশিষ্টদের মত চরিত্র আয়ত্ত করে। পাঁচ কলার কম বিকাশ সম্পন্ন গণ ও ছয় কলার বিকাশ সম্পন্নগণকে উহা আয়ত্ত করিতে দেখা যায়। ইহাদিগকে অপুষ্ট আসুরিক বলা হয়। ইহারা আসুরিক কলা বিশিষ্ট লোক হইতেও সমাজের অনিষ্টকারক। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মূল গ্রন্থে* দেখিবেন। আমরা মূল গ্রন্থে বিভিন্ন কলার বিকাশকে বিভিন্ন নাম দিয়াছি।

২৪। পাঁচ কলার বিকাশ সম্পন্নগণকে গণেশ স্তরের বিকাশ বলা হইয়াছে। ছয় কলা ও সাত কলার বিকাশকে যথাক্রমে সূর্য্য ও বিষ্ণু বলা হইয়াছে। পাঠকগণ নাম ধরিয়া বা কলা ধরিয়া যাঁহার যেমন সুবিধা আলোচনা করিতে পারেন।

২৫। সমাজ মাত্রই সাত কলার চিন্তাপুষ্টগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহারা আসুরিক হইলে ইহাদের দ্বারা পরিচালিত সমাজও আসুরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার ইহারা যদি দৈবীসম্পদ-সম্পন্ন হয় তবে ইহাদের দ্বারা পরিচালিত সমাজও সেরূপ উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইবে। সমাজকর্ত্তৃত্ব কিরূপ লোক করে উহা বুঝিতে পারিলে তাহাদের পরিচালিত সমাজ কিরূপ হইবে বুঝা যায়। আবার সমাজের মনোবৃত্তি দেখিলে বুঝা যাইবে সমাজকর্ত্তারা কিরূপ। সমাজ ও সমাজকর্ত্তার বাস্তব রূপ বুঝিবার ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। ইঁহারা যত শীঘ্র একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তাধারা একটা নূতন বিজ্ঞানে বা সংস্কারে গড়িয়া দিতে পারেন এমন কোন স্তরেরই লোক দ্বারা হয় না। বর্ত্তমান জাপান ও তুরস্ক যাঁহাদের চিন্তাশক্তিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহারা সকলেই এই স্তরের লোক ছিলেন। ভারতের ভাগ্যে এ ভাগ্য হয় নাই। এখানকার রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তার উপরে দাঁড়ায় নাই। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা এই স্তরের চিন্তায় শক্তিশালী (জিন্না প্রমুখ) তাঁহারা কেহই আজ পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজের স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নিজেদের চিন্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়িবার জন্য রাষ্ট্র ক্ষেত্রে নামেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা এই স্তরের চিন্তায় শক্তিশালী (সাভারকর প্রমুখ) তাঁহারা অদূরদর্শী পাঁচ কলার চিন্তাপুষ্ট (কংগ্রেস বামপন্থী) এবং ছয় কলার চিন্তাপুষ্ট (কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী) গণদ্বারা সাম্প্রদায়িক বলিয়া নিন্দিত। তাই তাঁহাদের প্রভাব দেশের যুবকগণের মধ্যে স্থান পায় নাই। তাঁহারাও নিম্ন স্তরের চিন্তায় নিয়মিত কংগ্রেস পতাকা তলে আত্মসমর্পণ করিতেছেন না। আমাদের মনে হইতেছে কংগ্রেসবাদ রূপ ভাঁওতায় আমাদের জাতির যুবক সম্প্রদায় ওবং সাত কলা পুষ্ট নেতৃগণ উভয়েই হাবুডুবু খাইতেছেন।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এই পুস্তকের সর্বত্র "মূল গ্রন্থ" অর্থে "ক্রম বিকাশের পথে" বুঝতে হবে।

২৬। এস্তরের চরিত্র সম্পন্ন মানুষ রাজা, জমিদার, শাসনকর্ত্তা, রাজপ্রতিনিধি, গোয়েন্দা, পুলিশ কর্ম্মচারি, গহনার কারবারি, ব্যাঙ্কার, সুখী কৃষক প্রভৃতিদের মধ্যে বেশী পাওয়া যাইবে।

২৭। এস্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মীদের দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনার কোন প্রয়োজন মনে করি না। একটা জাতির প্রাচীন চিন্তার সংস্কারই এস্তরের দার্শনিকতার প্রধান ভিত্তি। ইঁহারা যে কোন সংস্কারকে সামনে রাখিয়া জাতিকে নাচাইতে পারেন। এস্তরের ভাল বিকাশসম্পন্ন লোক যে কোন প্রকার শক্তিশালী কর্ম্মবিজ্ঞান উদ্ভাবন করিবার শক্তি রাখেন এবং সমাজকে উহা ধরাইয়া উহা দ্বারা সমাজের মহান উপকারও করাইতে পারেন। ইঁহারা আসুরিক হইলে অত্যন্ত দাম্ভিক হন। ইঁহাদের কর্ম্মনীতি দাম্ভিক হইলেও পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তাপুষ্ট কর্ম্মবিজ্ঞান হইতে বহু শতগুণ উন্নত ও শক্তিশালী জানিতে হইবে। ইঁহারা সমাজের খুব শক্তিশালী অংশ। সমাজ মাত্রই এইস্তরের লোকের কথায় উঠে ও বসে। হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান সময় এই স্তরের চিন্তার প্রভাব কম। ইহার কারণ প্রয়োজন হইলে পরে বলিব। ইঁহাদের প্রভাব সমাজ হইতে উচ্ছেদ করিবার শক্তি কেহই রাখে না। ইঁহারাই সমাজকর্ত্তা এবং ইঁহারাই শাসনকর্ত্তা। যে কোন মতবাদই পৃথিবীতে লইয়া এস না কেন ইঁহারাই শাসন করিবেন। রাজশাসনের যুগে ইঁহারাই শাসক, আবার প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র যাহাই স্থাপনা কর না কেন শাসকশ্রেণীর লোক এই স্তরের বিকাশ সম্পন্ন হইবেনই। এই স্তরের বিকাশসম্পন্ন শাসক যদি আট কলার চিন্তা না বোঝেন, অথবা এই স্তরের শাসকগণকে যদি আট কলার স্তরের জ্ঞানীরা পরামর্শ না দেন তবে ইঁহারা প্রায়ই দাম্ভিক হইয়া যান এবং আসুরিক হন। এ স্তরের শাসকগণকে যদি ছয় কলার বিকাশ সম্পন্নগণ শাসনকার্য্যের পরামর্শ দেন এবং ইঁহাদিগকে যদি ছয় কলার আদর্শ পাইয়া বসে তবে এ স্তরের শাসন দুর্ব্বল শাসন হয় এবং দুর্ব্বলতার দরুণ আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সমাজকর্ত্তা পরিচালিত সমাজদ্বারা দেশকে অনাচার ও উৎপাত সহ্য করিতে হয়। ছয় কলার বিকাশসম্পন্নগণকে শাসকের ঠিক ঠিক পরামর্শ দাতা না বলিয়া তোষামোদ কারী বলিলেই ঠিক হইবে। কাজেই ইহাদের পরামর্শকে শাসন দায়িত্বের পরিপন্থী জানিতে হইবে। সমাজে যদি এ স্তরের লোকের বা এ স্তরের চিন্তার বেশী প্রভাব থাকে তবে শাসকগণের উহা না মানিয়া উপায়ই থাকে না। সে অবস্থায় শাসকগণের উচিৎ সমাজে সাত কলার চিন্তা গ্রহণের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, নইলে তাঁহার শাসন দায়িত্ব খর্ব্ব হইবে এবং তাঁহার শাসিত সমাজও উচ্ছন্নে যাইবে। সাত কলার বিকাশসম্পন্ন শাসকগণকে যদি আট কলার বিকাশসম্পন্ন জ্ঞানিগণ পরামর্শ দেন অথবা সাত কলার বিকাশ সম্পন্ন শাসকগণ যদি আট কলার জ্ঞানশক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন তবে ইঁহাদের শাসন শক্তিস্তরের নীতির অনুরূপ শাসন হইবে।

২৮। আট কলার বিকাশসম্পন্নগণই ঋষিস্তরের মানুষ। যোগী, ত্যাগী, তপস্বীগণের মধ্যে এই স্তরের লোক পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময় এই স্তরের লোক দুর্ল্লভ। ইঁহারা সাত কলার বিকাশসম্পন্ন শাসকগণকে বা ভাবী শাসকগণকে ধৈর্য্য ধরিয়া শক্তিস্তরের আদর্শে গড়িয়া দিবেন। ইহাই ইঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম। ইঁহারা যে কিরূপ সমাজ

হিতৈষী হন উহার পরিমাপ করা অসম্ভব। ইঁহারা পৃথিবীস্থিত মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। ইঁহারাই প্রাচীন যুগে রাজগুরু হইতেন। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বেই এই স্তরের মহাপুরুষদের স্থানে পুরোহিত শ্রেণীর লোকের দ্বারা শাসক শ্রেণীর শিক্ষা দীক্ষা হইতেছিল। বৌদ্ধ যুগের বাদও এই স্তরের মহাপুরুষদের কদর সমাজে ও রাজশিক্ষায় কখনও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের উপর সমাজের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল সেটা পুরোহিত শ্রেণী নিজেদের জন্য করিয়া লইয়াছিল ; ইহার ফলে ভারতের পতন হয়। এই স্তরের লোক ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারস্থিত মহাপুরুষ। ইঁহারা প্রাকৃতিক এবং সরল জীবনযাপন করেন। ইঁহারা অত্যন্ত তেজস্বী এবং অত্যন্ত শান্ত। মূলগ্রন্থে আমরা ইঁহাদিগকে উন্নতস্তরের শিব আখ্যা দিয়াছি। আট হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ* রাজা বা ঋষিদের মধ্যেই হইয়া থাকে। বিস্তারিত মূলগ্রন্থে দেখুন।

২৯। ঊর্দ্ধ চার কলা এবং অনূর্দ্ধ পাঁচ কলা পর্য্যন্ত বিকাশসম্পন্ন লোকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুব বেশী। ইহারা সরল ধর্ম্মে বিশ্বাসী, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাকৃতিক জীবন প্রিয় হয়। মূলগ্রন্থে আমরা ইহাদিগকে নিম্নস্তরের শিব আখ্যা দিয়াছি। মুটে, মজুর, পেয়াদা, দপ্তরি, চাপরাশি, পূজারী, রাঁধুনী, চাওয়ালা, ও সাধারণ হোটেলওয়ালা, মেথর, প্রেস কম্পোজিটর, সহিস, গাড়োয়ান, ঝাড়ুদার, অরণ্যনিবাসী মানুষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এস্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ বেশী পাওয়া যাইবে। ইহাদিগকে যে কোনও মতবাদে নাচানো যায়। কৃষকদের বুদ্ধির বিকাশ এ স্তরের চেয়ে বেশী নহে কিন্তু কৃষকদের কর্ম্মবিকাশ, সাতকলার কর্ম্মবিকাশের অন্তর্গত হইবার দরুণ কৃষকদের মনোবৃত্তি ও ইহাদের মনোবৃত্তি এক প্রকার নহে।

৩০। সাড়ে চারকলা পর্য্যন্ত বিকাশসম্পন্ন লোকের সংখ্যা প্রতি ৩০০ তে ২৯৯ জনের বেশী হইবে। পাঁচকলার বিকাশসম্পন্ন জনগণের সংখ্যা প্রতি ৭০০ তে ১ জনেরও কম হইবে। ছয়কলার বিকাশসম্পন্নদের সংখ্যা প্রতি ৬০০তে ২ জন হইতে পারে। সাতকলার বিকাশসম্পন্নগণের সংখ্যা† প্রতি সহস্রে একজনেরও কম হইবে। আট হইতে ষোড়শ কলা বিকাশসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা নাই বলিলেও চলে। ইঁহাদের কর্মস্থলের ব্যবস্থা সমাজে আসিলে তাঁহাদের সংখ্যা প্রতি দশলক্ষে একজন হইতে পারে। বর্ত্তমান সময় পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশে চিন্তা ও কর্ম্মবিজ্ঞানের অপকর্ষ হইবার দরুণ এই উন্নততম মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। পাঁচ এবং সাত কলার বিকাশসম্পন্নগণের সংখ্যাও অপকর্ষ হইয়াছে। ছয়কলার বিকাশসম্পন্নগণের সংখ্যাও পৌরোহিত্যবাদ, বৈষ্ণববাদ এবং গান্ধীবাদের প্রভাবে যেরূপ থাকা উচিৎ উহা না হইয়া ভারতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছয়কলার চিন্তার প্রভাবে সমাজের মন মেয়েলি ধরণে গড়িয়া যায় বলিয়া উহার প্রশ্রয় কম। তাই ঐসব দেশে ছয়কলা পুষ্ট মানুষের সংখ্যা কম। আমাদের দেশের চিন্তার উৎকর্ষ হইলে উন্নততম বিকাশসম্পন্ন মানুষ এবং

---

* প্রকাশকের নিবেদন - "বিকাশ" শব্দটি পূর্ণতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

† প্রকাশকের নিবেদন - "সংখ্যা" শব্দটি পূর্ণতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

পাঁচ ও সাতকলার বিকাশসম্পন্ন মধ্যকলার মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং নিম্নতম কলার মানুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। সাত কলার চিন্তাদ্বারা নিয়মিত অপুষ্ট বিকাশ যাহাদের আছে তাহাদের সংখ্যা বলা এবং না বলা সমান, কারণ উহা কোন বিকাশের স্তর নহে। বর্ত্তমান সময় অপুষ্ট বিকাশের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপদের লক্ষণ। যতদিন শক্তিস্তরের কর্ম্মনীতি কেন্দ্রীয় শাসন লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না ততদিন ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহাদিগকে আমরা পতিত কলার বিকাশ বলিতে পারি। ইহাদের অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য সমাজের পতনই সূচনা করে। ছয় কলার বিকাশ হইতে যাহারা অপুষ্ট কলা হয় এরূপ লোকের সঙ্গেও আমাদের ভারতের ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত আছে। পরে আলোচনা হইবে। নিম্নস্তর হইতে যাহারা অপুষ্ট সাতকলা হয় তাহাদের সঙ্গে আস্থরিক শাসন ও আস্থরিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের সম্বন্ধ বেশী। ইহারা বেশীর ভাগই কেন্দ্রীয় নীতিতে আস্থরিক শাসনের ফলে বা দুর্ব্বল শাসনের ফলে প্রস্তুত হয়। শিক্ষা এবং সুসংস্কার দান ও কঠোর দমন নীতির প্রয়োগ করিয়া ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। সব স্তরের লোকের অন্ন বস্ত্রের সুবিধা করা এবং অনীতির মূল উচ্ছেদ করা শাসনের ইহাই লক্ষ্য এবং ইহাই আদর্শ হওয়া উচিত। যতদিন শক্তিবাদ আসিবে না ততদিন ইহা হওয়া অসম্ভব। একমাত্র শক্তিবাদই এই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে এবং শক্তিবাদের অভাবে আজ পৃথিবীতে এত দুঃখের বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের কেন্দ্রীয় শাসনের নীতি এইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে উন্নততম বিকাশ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পায় এবং পতিত কলা কমিয়া যায়।

৩১। মানুষের সমাজে যদি বিকাশের জন্য বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও ধর্ম্মবিভাগের স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে ভোটবাদকে ভিত্তি করিয়া শাসন কার্য্য চলিতে পারে না, কারণ নিম্ন কলার মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং ইহারা স্ত্রী, অন্ন ও বস্ত্রের প্রয়োজন মাত্র বুঝে। শাসন কার্য্যের অন্য কোন বিষয়ই ইহারা কিছু বুঝিবার শক্তি রাখে না। কাজেই শাসন কার্য্যে ইহাদের ভোট পাওয়া না পাওয়া একই কথা। ইহাদের জন্য অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্য্য এবং যৌন ঘটিত ব্যাপারে কঠোর শাসন নীতি শাসন বিভাগে থাকিলে ইহাদের সমস্যা মিটিয়া যায়। শাসন চলে সাতকলার চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত লোকের দ্বারা, কাজেই ভোটবাদ দ্বারা শাসননীতির কোন উৎকর্ষ আশা করা যায় না। শাসন নীতি উন্নত করিতে হইলে আটকলার বিকাশ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং সাত কলার বিকাশ সম্পন্নগণের চিন্তা মিলিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ হইলে মানব সমাজে আগত ও অনাগত সব সমস্যার সমাধান হয়। আটকলার বিকাশ সম্পন্নগণের পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে সমস্ত স্তরের বিকাশের প্রয়োজনীয় বস্তু নিরাপদ হয়। শক্তিবাদ ইহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসননীতি বলিয়া ঘোষণা করে। পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা। ইঁহারা উন্নত আদর্শবাদী এবং সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকারক কর্ম্মী। সাত কলার চিন্তার স্তরের মানুষ বেশীর ভাগ ধনীশ্রেণীর হইয়া থাকে। ইহারা আস্থরিক হইলে ইহাদের পরিচালিত সমাজে পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তার আদর্শে কোনও কর্ম্মক্ষেত্র থাকে না এবং অপুষ্ট সাত কলার লোকের দ্বারা ইহাদের মধ্য

স্তরের কাজটা সম্পন্ন হয়। ইহাদের সমাজস্থিত নিম্নস্তরের লোকগুলি লুঠতরাজে যত আনন্দ পায় ভাল কার্য্যে তেমন পায় না। যাঁহারা সাত কলার চিন্তার দৈববিকাশ তাঁহারা সমাজে যাহা করিতে চান তাহাতে পাঁচ ও ছয় কলার বিকাশস্তরের কর্ম্মের অনুকূল হয় এবং সমাজের ক্রমবিকাশপথও মুক্ত থাকে। কিন্তু সাতকলার দৈব বিকাশসম্পন্নগণ যদি আট কলার বিকাশসম্পন্নগণ দ্বারা নিয়মিত না হন তবে ইঁহাদের শাসন আসুরিক নীতির নিকট পরাস্ত হইবে। কাজেই বিকাশবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শাসন চালাইতে হইলে শাসন মন্ত্রণায় আট কলার বিকাশসম্পন্ন লোকের সংযোগ অপরিহার্য্য। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে আট কলার বিকাশকে বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজশক্তির কি বিপুল লক্ষ্য ছিল। আমরা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য রাজনীতির সামান্য একটু হাওয়া লাগাইয়া মানুষের প্রকৃত মঙ্গলকারক মানুষ যাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে সেই যোগী ও সাধু শ্রেণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদের নেতৃচিন্তনে ইহা পতনেরই লক্ষণ। সমস্ত সাধুসমাজ বিকাশে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে উহার বিচার না করিয়া উঁহারা যে উন্নত লক্ষ্যপথে আমাদের বালকগণের চিন্তাকে আকর্ষণ করে উহা বুঝিবার শক্তি আমাদের থাকা উচিত। যাহা হউক, শাসনের লক্ষ্য যদি বিকাশই হয় তবে আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের প্রভাবে যে সব অপুষ্ট কলার লোক প্রস্তুত হইয়া সমাজে লুঠতরাজ, নারীহরণ ও চুরি করিতে প্রশ্রয় পায়, তাহাদেরও বিরুদ্ধে সমাজের ও রাজদণ্ডের কঠোর নীতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৩২। আমাদের মনে হয় ভোটবাদের নীতি কিছু বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। স্বাধীনতার ভাঁওতায় ইহাকে আমরা সমাজে স্থান দিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা আজ পর্য্যন্ত শাসন নীতির অপকর্ষই হইয়াছে, উন্নতি হয় নাই। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য শাসন নীতিও বটে। ভোটবাদে ধনীরই সুবিধা হইতে পারে। ভোটবাদ থাকিবে কি যাইবে উহা লইয়া আমরা এখনও ভাবিতে চাহি না, কারণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য উহার প্রয়োজন হইতে পারে। ভোটবাদ দ্বারা যদি শাসন নীতির লক্ষ্য বিপদগ্রস্ত হয় তবে শাসনে অনীতির প্রশ্রয় পাইবে। উহার ফলে আবার দেবাসুর সংগ্রামের সূত্রপাত হইবে। কাজেই শক্তিবাদীর লক্ষ্য ভোটবাদ নহে, শাসন নীতির সংস্কার।

৩৩। পাঁচ, ছয়, সাত ও আট কলার চিন্তা মিলিয়া যে শাসন উহা উত্তম এবং শক্তিশালী শাসন। পাঁচ, ছয়, সাত মিলিয়া যে শাসন উহা দুর্ব্বল শাসন এবং পাঁচ, ছয়, সাত মিলিয়া যে আসুরিক শাসন উহা একটু সবল হইলেও কাম্য নহে। কারণ উহা দ্বারা শাসক ও শাসিত কাহারও বিকাশ অগ্রসর হইতে সাহায্য পায় না। ইহাতে শান্তি অসম্ভব। কাজেই শক্তিস্তরের শাসন ভিন্ন দেবাসুর সংগ্রাম অনিবার্য্য। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সাত কলার কিংবা ষোড়শ কলার কর্ম্মবিজ্ঞান ভিন্ন পাঁচ কিংবা ছয় কলার কর্ম্মবিজ্ঞানে নিয়মিত ষ্টেট চলিতেই পারে না। কাজেই শক্তিবাদীরা শক্তিস্তরের লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্যে বিভ্রান্ত হইবেন না।

৩৪। ভারতে শাসকগণের মধ্যে মাঝে মাঝে শক্তিস্তরের শাসন নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহা অবশ্যই রাজ শাসনের যুগেরই কথা। ঋষিগণের জ্ঞান এবং শাসকগণের কর্ম্মশক্তির মিলনে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই ঋষি স্থানে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ঋষিস্তরের চিন্তার স্থানে তাহাদেরই চিন্তার প্রাধান্য হইয়া দাঁড়ায়। পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ঋষি স্থানে হইবার দরুণ রাজাগণের চিন্তাজগতে শক্তিহীনতার লক্ষণ দেখা দেয়। বৌদ্ধ যুগেও রাজাগণের কর্ম্মশক্তির সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানীর জ্ঞানশক্তি মিলিত হইতে পারে নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের মধ্যে যাঁহারা রাজাগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের চিন্তা কখনও ছয় কলার (সূর্য্যস্তর) অতিক্রম করিয়া আট কলায় (উন্নত শিবস্তরে) দাঁড়ায় নাই। বৌদ্ধ যুগের পরেও রাজাগণের কর্ম্মশক্তির সঙ্গে জ্ঞানশক্তির সংযোগ সাধিত হয় নাই। ইহাতেও পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রজ্ঞানের শেষ সীমা ছয় কলার চিন্তাকে (সূর্য্য স্তর) অতিক্রম করিবার শক্তি রাখে না। ইহাদের শক্তি খুবই কম। আট কলার বিকাশসম্পন্ন (উন্নত শিবস্তরের) একজন মহাপুরুষের যেরূপ তেজস্বিতা, ত্যাগ, ঔদার্য্য এবং শান্তি থাকে তাহা ছয় কলায় অসম্ভব। ছয় কলার জ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র, কিন্তু আট কলার জ্ঞান তপঃলব্ধ জ্ঞান। যে শাসনের বিজ্ঞানে এক যুগে সাত এবং আটের মিশ্রণ ছিল উহা সাত এবং ছয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শাসন আসুরিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতে বাধ্য।

৩৫। পুরোহিত শ্রেণী ঋষিস্থানে নিজদিগকে দাঁড় করান রূপ কার্য্যদ্বারা নিজেদের পতনের সূচনা করিল। যে যাহা নহে সে যদি সেইরূপ নিজেকে দাঁড় করাইতে চায়, তবে উহা তাহাদের পতনের লক্ষণ বলিতে হইবে। শেষকালে রাজাদের তোষামোদ্ করা এবং সমাজের সামনে আপনাদিগকে ঋষি বলিয়া সাব্যস্ত করা এবং সমাজের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা ভিন্ন ইহাদের কোন কাজ এবং দায়িত্ব সমাজের উপর ছিল না। ছয় কলার কর্ম্ম এবং চিন্তাটা নিজের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অপুষ্ট সাত কলা (অপুষ্ট বিষ্ণু) আয়ত্ত করিল। এই স্বার্থপরদের প্রভাবে আমাদের সমাজ এবং রাজশক্তি দুইই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল।

৩৬। আসুরিক সাতকলার এবং অপুষ্ট সাত কলার মানুষকে (ছয় হইতে অপুষ্ট সাত) অত্যন্ত হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন বলিয়া জানিতে হইবে। আসুরিক কলা এবং অপুষ্ট কলা নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই ধারণা করিতে পারে না। আসুরিক কলা হইতে অপুষ্ট কলার চিন্তা আরও মলিন। ইহারা নিজেদের স্বার্থ এমন বোঝে যে অন্য কোন স্তরের লোকই তত বুঝিতে পারে না। যে কোন উন্নত মতবাদ, উন্নত শিক্ষা অপুষ্ট কলার বিকাশসম্পন্নগণকে দাওনা কেন ইহারা সবই অনুধাবন করিতে পারিবে কিন্তু উহার মধ্যে স্বার্থ টুকু ভিন্ন ইহারা আর কিছু গ্রহণ করিবে না। ইহাদের স্বার্থহানির ভয় সব চেয়ে বেশী। অপুষ্ট কলার লোক স্বার্থের সূত্র ধরিয়াই অগ্রসর হয়। বর্ত্তমান সময় পুরোহিত শ্রেণী, পাণ্ডা শ্রেণী, গাড়োয়ান, কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর পুলিসে অপুষ্ট বিকাশের লক্ষণ খুব বেশী। আমাদের দেশে সোশিয়ালিষ্ট কর্ম্মীরা কৃষকদিগকে যতটুকু স্বার্থ শিখাইতে চাহেন

কৃষক শ্রেণীর লোক উহার চেয়ে বেশী স্বার্থ বুঝিবার শক্তি রাখে। সমাজতন্ত্রীরা কৃষকদের নিকট হইতে দেশসেবার নামে যে ত্যাগটুকু আশা করেন কৃষকরা সোশিয়ালিষ্টদিগকে সময়কালে স্বার্থের বিনিময়ে ভাঁওতা দিয়া বিরুদ্ধদলে সরিয়া পড়িবার শক্তি উহা হইতে বেশী রাখে। ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিবে। বংশগত স্বার্থরক্ষার জন্য পুরোহিতশ্রেণী সমাজের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। এইখানে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই শ্রেণীর চিন্তাধারা কখনও সমাজের মঙ্গলের অনুকূল হইতে পারে না। মুসলমান আক্রমণের সময় হিন্দু শাসকগণ এত অহঙ্কারী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা এক হইয়া আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে পারেন নাই। ত্যাগ ও তপঃপূত ঋষি স্থানে স্বার্থান্ধ ও মলিন (পুরোহিত) চিন্তা রাজাগণের গুরুস্থান অধিকার করিবার দরুণ রাজাগণের মানসিক পতনের প্রতিকার হয় নাই। সে যুগে পুরোহিতচিন্তা সমাজের কর্ণধার হইয়াছিল। সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, যজন, যাজন ইহাদেরই হাতে ছিল। ইহারা সমাজের চক্ষে আপনাদিগকে করিয়া লইয়াছিল দেবতা এবং ইহাদের মনোজগতে ইহারা ছিল ঘোর স্বার্থান্ধ। মুসলমান আক্রমণে ইহাদের প্রভাবে আমাদের কেবল রাজশক্তিরই পতন হয় নাই ; ইহাদের প্রভাবে আমাদের সমাজেরও পতন হইয়াছিল। সমাজকে ভাগ করা, সমাজের একজনকে অন্যের চক্ষে হীন করিয়া রাখা এবং নিজেদের স্বার্থ দেখা ভিন্ন ইহাদের চিন্তার কোন উদার ভিত্তি নাই। আক্রমণকারীরা আমাদের সমাজের মধ্যে তাহাদের সভ্যতাও প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল এবং উহার দ্বারা সমাজের একটা বিরাট অংশকে সেই যুগে মুসলমান শাসকগণের সমর্থক করিয়া গড়িয়া লইয়াছিল। তাহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা সাত কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। বহু মহাপুরুষ ছয় কলার (সূর্য্যস্তর) চিন্তার ভিত্তিতে ধর্ম্মস্থাপনা দ্বারা সমাজ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহাদ্বারা পৌরোহিত্য-বাদের প্রভাবে আমাদের পতনোন্মুখ সমাজের পতনের গতি রুদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। মধ্যযুগে গুরুগোবিন্দ সিংহ কতকটা শক্তিস্তরের ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া এবং এ যুগে স্বামী দয়ানন্দজী সাত কলার স্তরের চিন্তার ভিত্তিতে সমাজের ভিত্তি দিয়া পৌরোহিত্যবাদের প্রভাব একটা সামান্য অংশসমাজ হইতে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের যে অংশ এখনও পৌরোহিত্যবাদের মুখ তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহারা আজ পর্য্যন্ত পৌরোহিত্যবাদের নিকট হইতে পতনের গতিরুদ্ধ করিবার মত শক্তি লাভ করে নাই।

৩৭। ছয় কলার কাজ হইল শক্তিস্তরের চিন্তাবিজ্ঞানকে প্রচার করা। শিক্ষায় আমরা লৌকিক অলৌকিক যাহাই শিক্ষা করি না কেন, শক্তিস্তরের ভিত্তিতে শিক্ষাদান হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রচার ও আন্দোলনের লক্ষ্য থাকিবে শক্তিস্তরের চিন্তাটা কিরূপ উহা জানাইয়া দেওয়া। পুরোহিতবাদের যুগের মত গান্ধীবাদ এ নীতির অপলাপ করিতেছে। প্রচারবিভাগ অহিংস থাকিবে কিন্তু অহিংসা (ছয় কলার শক্তি) দ্বারা কেন্দ্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রিত করিব এরূপ কথা অত্যন্ত মারাত্মক এবং সর্ব্বনাশকর। কেন্দ্রীয় নীতির লক্ষ্য অহিংসা নহে উহার লক্ষ্য শক্তিস্তর। অহিংসা দ্বারা অসুর দমন চলে না। অহিংসার আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া প্রচার শক্তিশালী হয়। ভারতে স্বাধীনতার অস্ত্রস্বরূপ অহিংসার অবলম্বন অর্থে শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে ইহাই বুঝায় যে স্বাধীনতার জন্য শক্তিশালী

দাবী করা যাইতেছে। ইহা কোন যুদ্ধনীতি নহে, ইহা দাবীরই নীতি। যে দাবীর মূলে মানুষের মনোজগতের নৈতিক সমর্থন আছে, উহা অহিংসার দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে (আসুরিক শাসকদের নিকট নীতি বলিয়া কোন বস্তু থাকে না)। ইহা যে পূর্ণ স্বাধীনতার অস্ত্র ইহাও স্বীকার করা যায় না। ভারতের বর্ত্তমান স্থিতিতে দাবী করা ভিন্ন হয়ত অন্য কোন অবলম্বন নাই। কংগ্রেস এখন দাবীর পথেই স্বরাজ পাইবার নীতি মানিয়া লইয়াছে। শক্তিবাদ ইহাকে কোন শক্তিশালী নীতি স্বীকার করে না। অহিংসবিদ্রোহ কোন শক্তিশালী বিদ্রোহ নহে। অহিংস বিদ্রোহকে কেন্দ্রীয় নীতির সংশোধন করিবার অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। জনসাধারণ যদি অহিংসার পথে আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া কেন্দ্রীয় নীতিকে সংশোধনের চেষ্টা করে তবে উহা ঠিকই হইবে। কিন্তু বৃটিশ ইচ্ছা করিয়া না দিলে ইহার দ্বারা স্বরাজলাভ অসম্ভব। তবে বৃটিশের বিপদে একটু সামান্য বেশী আদায় হয়ত হইতে পারে। ইহা দাবীর নীতি হইতে পারে কিন্তু ইহা কখনও কেন্দ্রীয় শাসনের নীতি হইতে পারে না। কোন সমাজ যদি ইহাকে কেন্দ্রীয় শাসনের নীতি বলিয়া মানিয়া লয় তবে সেই সমাজের ক্ষতি হইবে।

৩৮। কংগ্রেস শাসনতন্ত্র হাতে লইবার দরুণ তাহার নীতি আর ছয় কলার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না কারণ ঐ নীতিতে কেন্দ্রীয় শাসন চলে না। তাহাকে অন্ততঃ সাত কলার নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সাত কলার নীতিকে যদি ছয় কলার নীতি দ্বারা পরিচালিত করিবার চেষ্টা হয় তবে উহা দুর্ব্বল শাসন হইবে। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক আসুরিকতা এবং নারীনির্য্যাতন, গুণ্ডামী, অশান্তি, অনাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এখানে আরও একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কংগ্রেসপন্থীদের ধারণা যে তাহারাই একমাত্র স্বদেশপ্রেমী এবং সমাজহিতৈষী। বর্ত্তমান ভারতশাসনআইন যে গান্ধীবাদী আন্দোলনের ফল নহে, ইহা যে বহু পূর্ব্বে সাইমন কমিশন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দেয় শাসনতন্ত্র এবং গান্ধীবাদী আন্দোলনের ফলে এই শাসনতন্ত্রে যে প্রকৃত স্বদেশকর্ম্মীদের বাধা দিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া কংগ্রেসের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গান্ধীবাদী এই আন্দোলন হিন্দুসমাজের ক্ষতিরই কারণ ঘটাইয়াছে। ইহা না করিয়া কংগ্রেস যদি সাত কলার স্তরের চিন্তার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া ইহাকে গ্রহণ করিয়া পরে ইহাকে কাজের উপযোগী করিবার জন্য নূতন ভাবে আন্দোলনের সৃষ্টি করিত, সেই রূপে তবে কেন্দ্রীয় শাসনে কংগ্রেসের শক্তি এখন হইতে শক্তিশালী হইত। ইহা দ্বারা বাংলার হিন্দুরা যেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে উহার পরিমাপ করিবার শক্তি গান্ধীবাদে নাই। আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে গান্ধীবাদ আমাদের ক্ষতি করিয়াছে। ছয় কলার বিকাশের কর্ম্মনীতি যে আমাদের ক্ষতি করিয়াছে উহা জানা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেসবাদীরা মনে করেন যে তাঁহারা একমাত্র স্বদেশপ্রেমী ও দেশও যদি ঐ কথা মানিয়া লয় তবে ইহাও এক নূতন আলোকে আমাদের দেশে পৌরোহিত্যবাদের আমদানী বলিতে হইবে। এক যুগে রাজারা যেমন পৌরোহিত্যবাদের হাতের পুতুল হইয়াছিলেন এযুগেও কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলির ঠিক সেই দশা হইয়াছে। ছয় কলার চিন্তাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস তাহাদিগকে উঠায়, বসায় এবং নাচায়। রাজা যেমন পুরোহিতগণের অধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কারণ পুরোহিতেরা সমাজকে শাস্ত্রের

বচন দ্বারা যেমনি খুসী তেমনি নাচাইতে পারিত সেইরূপ মন্ত্রীমণ্ডল কংগ্রেসের হাতের পুতুল হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের শাস্ত্র ধরিয়া দেশকে যেমনি খুসী তেমনি নাচাইতে পারে। পুরোহিত যেমন সমাজের চক্ষে দেবতা হইয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ কংগ্রেস ছয় কলার চিন্তায় বদ্ধ থাকিয়াও সমাজের চক্ষে দেবতা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসীরা যদি তাহাদের চিন্তার স্তর এবং কর্ম্মনীতির লক্ষ্য পরিবর্ত্তন না করে তবে ইহারা হিন্দুদের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। কংগ্রেসকর্ম্মীরা অত্যন্ত ভুল বুঝিবেন যদি তাঁহাদের ঐরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে তাঁহারাই দেশের একমাত্র সর্ব্বস্ব। ছয় কলার স্তরে দাঁড়াইয়া মানুষ যেইটুকু কর্ম্মবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে তাহা হইতে সাত কলার স্তরের (বিষ্ণু স্তরের) কর্ম্মবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। সাত+আট কলার স্তরের চিন্তা (বিষ্ণু+শিব) আরও উন্নত। কংগ্রেস অত্যল্প বিকাশের কর্ম্মবিজ্ঞান ধরিবার দরুণ দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে উহা সংশোধন করিতে বহুদিন লাগিবে। যেটুকু শাসন কর্ত্তৃত্ব দেশ পাইয়াছে উহাকে ঠিক ঠিক শক্তিস্তরের কর্ম্মবিজ্ঞানে পরিচালিত করিতে বা করাইতে হইবে। শক্তিবাদীরা সর্ব্বত্র এমন আন্দোলন সৃষ্টি করুন যাহাতে শাসনের কেন্দ্রীয় নীতি পক্ষপাতহীন হইয়া বিকাশের অনুকূল মূর্ত্তি ধারণ করে। কেন্দ্রীয় নীতি যদি শক্তিস্তরের নীতি ধরিয়া চলে তবে জনসাধারণের উহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণ থাকে না। কিন্তু ছয় কলার চিন্তার স্তরে দাঁড়াইয়া কোন কর্ম্মীসঙ্ঘই এরূপ আশা করিতে পারে না যে তাহাদের হাতে সমস্ত স্তরের মানুষের বিকাশ-নীতি নিরাপদ। জনসাধারণ জানিয়া রাখুন বর্ত্তমান কংগ্রেসনীতির দ্বারা অনাচার এবং আস্থরিকতা বৃদ্ধি পাইবে।

৩৯। মুসলমান সমাজের একটা শক্তিশালী অংশ ছয় কলার কর্ম্মবিজ্ঞানের নীতিকে অতিক্রম করিয়া সাত কলার কর্ম্মবিজ্ঞানের নীতি লইয়াছে। হিন্দুদেরও কর্ত্তব্য ঐরূপ শক্তিশালী হিন্দু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া নিজেদের ন্যায্য অধিকার ও ভারতীয় কৃষ্টি রক্ষা করা। ছয় কলার কর্ম্মভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সাত কলায় প্রতিষ্ঠিত মুস্লিম লীগের দাবীর চাপে হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করিবার শক্তি রাখে না। মুস্লিম লীগ এই পর্য্যন্ত মুসলমান স্বার্থরক্ষা এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করে নাই। ইহাদের কর্ম্মধারা এযুগে অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইহাদের নিজেদের সমাজে এইরূপ আন্দোলন দ্বারা যে বীজ বপন করিলেন তাহার দ্বারা ঐ সমাজে অপুষ্ট সাত কলার চিন্তা প্রশ্রয় পাইবে। কংগ্রেসপন্থীরা কথায় ঐ নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কার্য্যে উহার সমর্থনের অনুরূপ কার্য্যই করিয়াছেন। ইহা কংগ্রেসের নীতির দুর্ব্বলতা। কিন্তু কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক সাত কলার চিন্তাবিজ্ঞানে নিয়মিত ঐ সমাজকে নিজের মধ্যে পাইবে না। অনেকে হয়ত বলিবেন কংগ্রেসের মধ্যেও বহু মুসলমান সভ্য রহিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে তাঁহারা হিন্দু সমাজের তোষামোদ আদায় করা ভিন্ন নিজ সমাজে কংগ্রেসের স্বপক্ষে কোনও শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করেন নাই। নিজের সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কোনও সমর্থনও নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসের শক্তিতে নাম বাগাইয়া পুনরায় নিজের সমাজে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াও ইঁহাদের মনোবৃত্তি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বাহিরে

যাইয়া দাঁড়ায় নাই। ইঁহাদের ত্যাগ খুবই কম। এদিকে বামপন্থী কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় কংগ্রেস যে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়াই দিবার কথা ভাবিতেছে, ইহার ফলে বৃটিশ ও মুস্লিম লীগের চালে কংগ্রেস এমন কিছু পরিবর্ত্তন ফেডারেশনে লাভ করিবে যাহার ফলে কংগ্রেস বর্ত্তমান সময় যতটা শক্তিমান হইতে পারে তাহা হইতেও শক্তিহীন হইয়া যাইবে। আমরা একথা স্পষ্ট বলিতেছি যে রাজনীতি বুঝিবার মত শক্তি এখনও কংগ্রেসের হয় নাই। কংগ্রেস এখনও অন্ততঃ সাত কলার চিন্তা বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভারতের সুবিধা হইবে। উহা করিতে হইলে হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী হইতে দিয়া পরে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সমাজের সামনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা সমান তালে ধরা কর্ত্তব্য হইবে। হিন্দু মহাসভা শক্তিশালী হইলে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি ভিন্ন কমিবে না।

৪০। পূর্ব্বে বলিয়াছি কেন্দ্রীয় শাসননীতিতে আসুরিক সাত কলার ভিত্তি থাকিলে সমাজে পাঁচ ও ছয় কলার কর্ম্মস্থল সঙ্কোচ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সকলেই আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের দেশে পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তার অনুৎকর্ষও হয় নাই। অন্যদেশ আক্রমণ করা, অন্যদের শোষণ করা, এ সব আসুরিক কেন্দ্রীয়নীতির লক্ষণ। য়ুরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির ইহাই আদর্শ। তাঁহারা অন্য দেশের জন্য আসুরিক হইলেও নিজেদের দেশের জন্য আসুরিক নীতির স্থাপনা করেন নাই। সেইজন্য তাহাদের দেশে পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তা অটুট আছে।

৪১। শক্তিবাদের লক্ষ্যই নহে যে আসুরিক নীতি স্থাপনা করা হয়। সাত কলার স্তরের আসুরিক বিকাশ এই কলার পতনেরই লক্ষণ। তাহা হইলেও একথা স্পষ্ট বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আসুরিক বিকাশ অপ্রাকৃত নহে। কেন্দ্রীয় নীতিতে এবং সামাজিক চিন্তাতে দুর্ব্বলতা থাকিবার দরুন ইহার অত্যাচার সমাজকে সহ্য করিতে হয়। সমাজ কেন্দ্রীয় নীতিকে সংশোধনের কর্ম্ম গ্রহণ করে না বলিয়া সমাজের উপর ইহা প্রাকৃতিক পীড়ন। সমাজের দায়িত্ব-হীনতার জন্য সমাজকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে কেন্দ্রীয়-নীতিতে শক্তিস্তরের কর্ম্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রত্যেক স্তরের মানুষের বিকাশপথ মুক্ত থাকুক। প্রকৃতির এই নিয়মে সাহায্য দান করাই শক্তিবাদীর লক্ষ্য এবং কর্ত্তব্য। এই লক্ষ্যে আমরা কার্য্য করিয়া কতটা কৃতকার্য্য হইলাম, কি না হইলাম, উহার হিসাব করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। আমি যেখানে যতটুকু কর্ম্মক্ষেত্র পাইব উহাকে ঠিক বিকাশবিজ্ঞানে লাগাইয়া চলিব। আবার যে সব কর্ম্মীকেন্দ্র দুর্ব্বল চিন্তাবিজ্ঞানে নিয়মিত উহাদিগকেও ভুল ধরাইতে চেষ্টা করিব। শক্তিবাদী কিছুতেই কোন দুর্ব্বল কর্ম্মবিজ্ঞানের সহায়ক হইবে না।

৪২। রাজ শাসনের যুগ হইতে ভোটবাদের যুগে শাসন নীতির অপকর্ষ হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে রাজার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সফল হয় নাই। রাজার আসুরিক শাসনের ফলে দেবাসুর যুদ্ধের সূচনা হয় কিন্তু যাঁহারা এই

সূচনার ঋষি তাঁহারাও মনোবিজ্ঞান এবং কর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্পজ্ঞ হইবার দরুণ তাঁহাদের প্রদত্ত ইতিহাসবিজ্ঞান ভুল ছিল। তাই যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর লক্ষ্যে ইহার সূত্রপাত হয় ইহার কোনটাই এই বিপ্লব দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। ইহার ফলে আসে সমাজে বণিকের শোষণ ও ধনিকের মর্ম্মস্পর্শী অত্যাচার। সামন্তশাসনে যে অত্যাচার ছিল উহা হইতে এই অত্যাচার বেশী মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ হয়। ইহার ফলে ধন-সাম্যবাদের সূত্রপাত হয়। ইহাকে শ্রমিক-বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লবের যাঁহারা ঋষি তাঁহারাও ছিলেন অল্পদর্শী। কাজেই যে লক্ষ্যে ইহার আরম্ভ, উহাও সফল হইতে পারে নাই। ইঁহারা যে সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে মানুষের মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে টক্কর লাগিয়া।

৪৩। পাঁচ কলার বিকাশ (গণেশ কেন্দ্র পুষ্টগণ) সম্পন্নগণই বিপ্লবের নামে নাচিয়া উঠেন। ইহা এই স্তরের মানুষের অল্পজ্ঞতার স্বাভাবিক চপলতা। বিপ্লবের ঋষিরা প্রথমে এই স্তরের লোকেদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেক বিপ্লবে এই স্তরের যুবকেরা প্রথম দীক্ষা লয়। ইহাদের চিন্তার খোরাক জুটাইবার জন্য ক্রমেই লেখকশ্রেণী জুটিয়া যান। লেখকশ্রেণী (ছয় কলার কর্ম্মজগৎ) শুধু অর্থের জন্য ইহাদের মনের মত চিন্তা ছড়াইতে থাকেন। এইভাবে বিপ্লবের প্রচার প্রবল হয়। অর্থের লোভে এই শ্রেণীর চিন্তার প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়া ইঁহারা প্রগতিপন্থী লেখক এই সম্মানসূচক নাম গ্রহণ করেন। এইভাবে ইঁহারা যশ এবং অর্থ দুইই বাগাইয়া লন। ইহা না করিলে ইহাদের পেটের অন্ন জোটে না। ক্রমে ইহাদের শক্তিশালী (সাত কলা পুষ্ট) নেতাও জুটিয়া যান এবং বিপ্লব সফল হয়। কিছুদিন পরে দেখা যায় মানুষের মনোজগতের যিনি কর্ত্তা সেই প্রকৃতি না জানি কোন্ শক্তিবলে কেন্দ্রীয় শাসনের যিনি কর্ণধার তাঁহাকে সাত কলার মানুষ করিয়া গদিতে বসাইয়াছেন। প্রগতি লেখকশ্রেণী কিছুদিন পরে দেখা যায় সুর বদ্‌লাইয়া আবার সেই 'পেটকোওয়াস্তে' তাঁহারই চিন্তার স্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা এই কথা বলিয়া রাখিতেছি শক্তিবাদ বিপ্লব সমর্থন করে না। প্রজাশক্তি, গণশক্তি, যুবশক্তি, সমাজশক্তি সকলেরই মূল্য মানি - যদি কেন্দ্রীয় নীতিতে আসুরিক বা দুর্ব্বল নীতির প্রশ্রয় থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতিতে শক্তিস্তর থাকিলে, কাহারও সাধ্য নাই যে বিপ্লব আনিতে পারে। চার কলার লোককে তুমি কিছুতেই নাচাইতে পারিবে না যদি তাহাদের পেট ভরা থাকে। পাঁচ ও ছয় কলার লোকদিগকে তুমি নাচাইতে পারিবে না যদি নারী নির্য্যাতন, গুণ্ডামী এবং সমাজের বিভিন্ন শাখায় অনীতির প্রশ্রয় না থাকে এবং এই স্তরের লোকদের মধ্যে বেকারসমস্যা না থাকে। শক্তিস্তরের শাসনে ইহা থাকে না। কেন্দ্রীয় শাসন আসুরিক হইবার দরুণ দেবাসুর যুদ্ধ আসিতে বাধ্য। আবার কেন্দ্রীয় নীতির দুর্ব্বলতার জন্য অসুর সৃষ্টি হইলে দেবাসুর সংগ্রাম অপরিহার্য্য। বিপ্লবের মূলে কেন্দ্রীয় নীতিতে আসুরিকতার প্রশ্রয় থাকে, ইহাতেই বিপ্লবের স্বপ্ন বিপ্লবের ঋষি দেখেন। কিন্তু বিপ্লবের ঋষি অত্যন্ত অদূরদর্শী, তাই তিনি সংশোধনের নির্দ্দেশ না দিয়া বিপ্লবের পথ দেখাইতে চাহেন। বিপ্লব দ্বারা সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি হয়, বিপ্লবের লক্ষ্যও ব্যর্থ হয়। কাজেই সংশোধনই প্রাকৃতিক নিয়ম, বিপ্লব নহে। কেন্দ্রীয় নীতিকে শক্তি স্তরের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্রমাগত আন্দোলন ও সংগঠন করিতে হইবে। জনমত প্রবল

হইয়া যতক্ষণ কেন্দ্রীয় আস্থরিক শাসনকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে না ততক্ষণ শক্তিবাদীদের কর্ম্মনীতি ইহাতেই আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। ইহাতে কেন্দ্রীয় নীতি সংশোধিত হতে বাধ্য। যদি না হয় তবে কেন্দ্রীয় নীতিকে স্বতঃই বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় নীতি অনাস্থরিক হইলে আন্দোলন দ্বারাই উহা সংশোধন হইয়া যাইবে। যদি উহা আস্থরিক হয় তবে উহার পতন অনিবার্য্য - ইহা শক্তিবাদ ভালরকমেই প্রমাণ করিতে পারে।

৪৪। বিষ্ণুস্তরের (সাত কলার) কর্ম্মনীতির ভিত্তির উপরই সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসিজম্ স্থাপিত। সোশিয়েলিজম্ গণেশ স্তরের (পাঁচ কলার) কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু ঐ নীতিতে ষ্টেট চলে না। কাজেই ষ্ট্যালিনের রুষিয়া এখন আর সোশিয়ালিজমের রুষিয়া নাই। এজন্য ষ্ট্যালিনকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐ দেশের মার্ক্স পন্থীদের উপর ফাঁসির রজ্জু ঝুলিতেছে। এই জন্য দোষী ঐ গণেশস্তরের (পাঁচ কলার) চিন্তাবিজ্ঞানে নিয়মিত কর্ম্মবিজ্ঞান। সাধারণ লোক এসব তত্ত্বের সম্বন্ধে কী জানে? তাহারা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছে দেশের বড়লোকদের সমান অর্থ তাহাদিগকে পাইতে হবে। যদি ষ্ট্যালিন-রাজত্ব উহা দিতে না পারে তবে উহাকে উল্টাইয়া দিতে হইবে। যাঁহারা নেতা তাঁহারা সব বুঝিতে পারেন কিন্তু প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব করিবার মোহ তাঁহাদিগকে এরূপ হীন কর্ম্ম করিতে উৎসাহিত করিতেছে। স্তরাং তাহারা ঐ মৃত বিজ্ঞানে কাজ পাইবার জন্য বৃথা আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিতে সুযোগ পাইতেছে। ঐ দেশের সোশিয়েলিজম্কে এখন মার্ক্স বা লেনিনের সোশিয়েলিজম্ বলা যায় না। উহাকে এখন আমরা মস্কোবাদ নাম দিতে পারি। মস্কোবাদকে নিত্যকার ফাঁসী ঘরের দ্বার বন্ধ করিতে হইলে উহাকে সোশিয়েলিজম্ নামক কর্ম্মবিজ্ঞানকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং অন্ততঃ বিষ্ণু স্তরের (সাত কলার) কর্ম্মবিজ্ঞানে নিয়মিত কোন সমাজতত্ত্ব তাহাদের বুঝিবার জন্য দিতে হইবে। যতদিন সমাজ পাঁচ কলার কর্ম্ম-বিজ্ঞানের মোহ ত্যাগ করিতে পারিবে না ততদিন ঐ রক্তপাতের শেষ নাই। আমরা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, দলতন্ত্র, সবই মানি যদি উহার নীতি শক্তি স্তরের নীতি হয়। আবার উহার যে কোন একটাকেই আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি যদি উহা আস্থরিক হয় এবং প্রজাশক্তি ও সংগঠন শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস থাকে। আমরা শক্তিবাদ নামক সঙ্ঘের ভিত্তি এই বিজ্ঞানেই দিয়াছি। এই সঙ্ঘের ব্যাপকত্ব মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া মজুর পর্য্যন্ত এবং বনবাসী যোগী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষতলনিবাসী ভিখারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ছড়াইতে হইবে। শক্তিবাদ সংশোধনের পথেই আন্দোলন চালাইবে; বিপ্লবের পথে নহে।

৪৫। মানুষের সমাজ প্রগতির পথে চলিতে যাইয়া শেষকালে ষ্টেটহীন সমাজে পরিণত হইবে ইহা কবিরও কল্পনা হইতে পারে না। মনুষ্য সমাজের ইতিহাস এরূপ কোনও প্রগতির ইতিহাস নহে। উৎপাদনের করণ ও প্রণালী পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কোন পরিবর্ত্তন আসে নাই। মানুষের বিকাশবিজ্ঞানের তত্ত্ব না জানিলে এ কথা মুখে বলা

চলে কিন্তু কাজে উহা হয় না। কারণ বিকাশ বিজ্ঞানে উহা খাপ খায় না। যাহা বিকাশ বিজ্ঞানে খাপ খায় না উহা করিতে গেলে বিপরীত অশান্তি সহ্য করিতে হয়। কেন্দ্রীয় শাসননীতিতে পূর্ণস্তর পর্য্যন্ত বিকাশের সুযোগ ও অনুকূল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আবার কোন স্তরের পতনকলার (অপুষ্ট বিষ্ণুকলার) অনীতিকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। মানুষ প্রথম যুগে প্রাকৃতিক শাসনে নিয়মিত ছিল। সেই যুগে পাঁচ, ছয় ও সাত কলার মানুষ জন্মই লইত না। পরে পাঁচ, ছয় ও সাত কলার স্তরের মানুষের জন্ম হইবার সঙ্গে যুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যতদিন পাঁচ, ছয় ও সাত কলার মানুষের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পথে বাধা দেওয়া যাইবে না ততদিন ষ্টেটহীন সমাজ হওয়া অসম্ভব। মার্কস্ পন্থীরা যেরূপ ষ্টেটহীন সমাজের স্বপ্ন দেখিতেছেন উহার স্বরূপ আমাদের দেওয়া প্রথম যুগের শাসকহীন সমাজের অনুরূপ নহে। উহা অন্য প্রকারের। উহা অত্যন্ত মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাহীন সমাজ কল্পনা। এরূপ কল্পনা লইয়া যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন তাঁহাদিগকে আমরা দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, কারণ উহার ফলে সমাজে দৈত্য নীতির আমদানী হইতে বাধ্য।

৪৬। মার্কস্ পন্থীরা জন্মান্তর মানেন না, মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বও মানেন না। মানুষ তাঁহাদের মতে কতকগুলি সামাজিক সম্বন্ধের সমষ্টি। তাঁহাদের মতে মানুষ মরে, সমাজ মরে না। বানরের মত কোন জীবের সমাজ অন্ন সমস্যায় এক সময় লেজ কাটাইয়া মানুষরূপে পরিণত হইয়াছিল। সে সমাজ পারিপার্শ্বিক স্থিতির মধ্যে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার টক্করের সম্মুখীন হয়। তাহাতে সে তাহার উৎপাদন প্রণালী বদ্‌লাইতে থাকে। এরূপ হইবার পথে এখন সে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা প্রগতিতে শেষ কালে ষ্টেটহীন সমাজে পরিণত হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের ঐরূপ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসতত্ত্ব নাকি খুব ভাল লাগিয়াছে। তাই তাহারা ইতিহাসের গতিকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অর্থ ও স্থূলকে ভিত্তি করিয়া একটা উদ্ভট কল্পনার আড়ালে সব কিছুর ব্যাখ্যা করা ইঁহারা পছন্দ করেন। ইঁহাদের নিকট অন্য কোন নীতি অনীতি নাই। ইহারা মানুষকে পশু হইতে বেশী কিছু ভাবিতে পারে না। নারী নির্য্যাতনের প্রতিবাদ শুনিলে ইহারা 'আদর্শবাদী' বলিয়া হাততালি দেয়। যাহাদের নীতিটা পাঁচ কলার চিন্তা বিজ্ঞানে নিয়মিত, তাহাদের নিকট পশুত্বের মনোবিজ্ঞানের এই অভেদ নীতির সমর্থন স্বাভাবিক। তাহারা একবার তাহাদের অতি প্রিয় রুশ দেশের হাওয়া খাইয়া আসিলে তাহাদের ইতিহাসের প্রগতিটা মিলাইবার সুযোগ পাইবে।

৪৭। শক্তিবাদীরা জন্মান্তর মানিবে কি না মানিবে উহা লইয়া আমাদের ভাবিবার কিছুই নাই। কারণ জন্মান্তর সত্য হইলেও উহাকে না মানা একটা স্তরের বিকাশবৈশিষ্ট্য। মানুষের মনোজগতের বিকাশ ধরিয়া যেরূপ বিজ্ঞান আমরা সাজাইয়াছি উহা বৈজ্ঞানিকের কাঁটার মাপে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইহা যে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। উহাতে কল্পনার কথা একটিও নাই। শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় নীতিতে ইহাদের

প্রত্যেকের বিকাশের অনুকূল সুবিধা থাকিবে ইহা ভিন্ন আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। মানুষের প্রথম সমাজে আমরা দুই প্রকার মানুষ পাইয়াছি। এক চার কলার মানুষ, অন্য আট কলার মানুষ। যতদিন সমাজে শুধু এই স্তরের মানুষ থাকে ততদিন আমরা ইহাকে আমাদের গ্রন্থে শিবের যুগ বা আদি যুগ বলিয়াছি। ইহাদের জন্য শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইহার পর সামাজিক শাসনের যুগ (বিষ্ণুযুগ) আসে। সামাজিক শাসনের যুগের পর রাজশাসনের যুগের সূচনা হয়। রাজশাসনের যুগে শাসননীতি কখনও সাত কলার নীতি বিজ্ঞানে অনাসুরিক, কখনও আসুরিক এবং কখনও ষোল কলার নীতি বিজ্ঞানে পূর্ণ নীতির স্তরে নিয়মিত শাসন-বিজ্ঞান ছিল। আদিযুগ হইতে মানুষের সমাজের পরিবর্ত্তন, যাহা বিভিন্ন প্রকারের বিকাশ-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাবে হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং রাজশাসনের যুগের উৎপত্তির পর শাসনের এই নীতির পরিবর্ত্তন ও উত্থানপতনের কথাই মানব সমাজের ইতিহাস। ইহা সোশিয়েলিজমের প্রগতির ইতিহাস নহে। কিপ্রকার শাসন ব্যবস্থায় কিরূপ বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং কিরূপ দর্শন, রীতি, নীতি, কিরূপ কেন্দ্রীয় শাসনের পরিণতিতে হওয়া স্বাভাবিক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এইখানে হওয়া অসম্ভব। ভারতের জ্ঞান যে এত উন্নত হইয়াছিল উহার কারণ আছে। শক্তি-স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শাসন নিয়মিত থাকিলে এই শাসন ব্যবস্থা আসুরিক নীতির সহিত টক্কর দিবার জন্য শক্তিশালী হয় এবং উন্নত বিকাশসম্পন্ন মানুষের জন্মগ্রহণের জন্য উহা অনুকূল হয়। শক্তিস্তরের নীতিতে শাসননীতি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নির্দ্দেশ। ইহাই প্রকৃত জন মঙ্গলকর কেন্দ্রীয় নীতি। যে কোনভাবে উহার ব্যতিক্রম হইলে আসুরিক অনাচার আরম্ভ হয়। যতক্ষণ কেন্দ্রীয় নীতি শক্তিস্তরের নীতি লইবে না ততদিন ইহার স্থায়ী প্রতিকার হইবে না। মার্কস্ পন্থীদের কথায়, ষ্টেট হ'চ্ছে একটি শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার যন্ত্র বিশেষ। কাজেই ষ্টেটহীন সমাজ না আসা পর্য্যন্ত মার্কস্ পন্থীদের কাজের বিশ্রাম নাই। আমরা বানরের মত কোন জীবের সমাজকে সমাজের আদিতে স্বীকার করি না; আবার ষ্টেটহীন সমাজও স্বীকার করি না। ষ্টেট যদি একটা সমাজকে শোষণ করিয়া আর একটা সমাজকে পুষ্ট করিয়া দিবারই যন্ত্র হইয়া থাকে, তবে উহা আমাদের বিজ্ঞানে আসুরিক শাসন। উহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া শক্তিস্তরের শাসননীতির স্থাপনা করিতে হইবে। শক্তিবাদীর কর্ম্মলক্ষ্য শক্তিবাদীগণকে বিকাশে সাহায্য করে; কিন্তু মার্কস্ পন্থিগণকে পশু বা পশু হইতে একটু উন্নত স্তরের চিন্তায় আনিলেও উহাতে তাহাদের বিকাশ পাঁচ কলার উপরে আসা অসম্ভব। কর্ম্মী হিসাবে মার্ক্স পন্থীরা যাহা লাভ করেন তাহা ইহাই। ষ্ট্যালিনের শাসননীতিতেও সাত কলার চিন্তা ও কর্ম্মবিজ্ঞান ফুটিয়া রহিয়াছে। যে বিপ্লব রুশিয়ার শোষণবাদকে শেষ করিয়া বহু মানবকে মুক্তি দিয়াছে উহাকে আমরা সমর্থন করি, কিন্তু যে নীতি একদিন ধনীর রক্তে দেশ রঞ্জিত করিয়া আবার ধনবৈষম্য স্থাপনে উৎসাহ দিয়াছে উহাকে আমরা কি বলিব? আবার যে নীতিতে দৃঢ় থাকিয়া বীর কর্ম্মীরা একটা বিরাট বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিলেন সেই কর্ম্মীরাই নূতন শাসন ব্যবস্থায় শিরশ্ছেদের উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন, ইহা কি কোন নীতিজ্ঞের নীতি হইতে পারে? যাহা হউক পাঠক জানিয়া রাখুন পাঁচ কলার চিন্তাবিজ্ঞানে এবং

কর্ম্মবিজ্ঞানে ষ্টেট চলিতেই পারে না। ষ্টেট চালাইতে হইলে অন্ততঃ বিষ্ণুস্তরে (সাত কলায়) আসিতেই হইবে।

৪৮। সাত কলার আসুরিক ষ্টেটকে অনেক অশান্তির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং নিষ্ঠুর আচরণের মধ্য দিয়া চালাইতে হয় এবং নানা প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। এইজন্য শক্তিস্তরের কর্ম্ম ও নীতিবিজ্ঞানে ষ্টেট বা কেন্দ্রীয় শাসন নিয়মিত করা প্রয়োজন।

৪৯। গান্ধীবাদী কংগ্রেসের চিন্তার প্রাবল্যে আমাদের দেশের কর্ম্মীদের নীতিজ্ঞান নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুণ্ডাদের গুণ্ডামী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে সোশিয়েলিজমের প্রগতির ইতিহাস আমাদিগকে বানর বানরীর বা কুকুর কুকুরীর মত স্বাধীন জীবনের লোভ দেখাইয়াছে। অন্যদিকে গান্ধীবাদ কর্ম্মীদিগকে নপুংসক করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও গুণ্ডামী দিনের পর দিন বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। গান্ধীবাদের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গুণ্ডামীর প্রশ্রয় দিতেছে এবং উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিতেছে সোশিয়েলিজমের সমর্থক নানারূপ মনোবিজ্ঞানের কথা। যাহারা গুণ্ডামী করে তাহারা বেশীর ভাগ মুসলমান বলিয়া কংগ্রেসপন্থীরা ঐ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলিতে দেয় না। কংগ্রেসের সমর্থক কাগজগুলিতে এইসব গুণ্ডামীর কোন শক্তিশালী প্রতিবাদ পর্য্যন্ত হয় না। যে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মুস্লিম লীগের সহিত হিন্দুদের পক্ষ লইয়া সন্ধি করিতে ব্যস্ত, সেই কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী কোথায়? যে কংগ্রেস জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাদীগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের অস্বাভাবিক আব্দারে ইন্ধন যোগাইতেছে উহাকে আমরা জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। জাতীয়তাবাদ বলিতে যদি জাতির প্রত্যেক স্তরের নরনারীর বিকাশের সহায়ক কোন প্রতিষ্ঠান হয় এবং জাতীয়তাবাদ বলিতে জাতির প্রত্যেক স্তরের মানুষের মধ্যে গুণ্ডামী ও অত্যাচার উচ্ছেদের জন্য নিষ্ঠাসম্পন্ন কোনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয় তবে আমরা উহাকে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিতে পারি, নইলে নয়। ইহা কেবল শক্তিবাদ বিজ্ঞানে নিয়মিত কোন চিন্তাশীল মানুষে সম্ভব এবং শক্তিবাদ বিজ্ঞানে নিয়মিত কোনও শাসননীতি এইরূপ জাতীয়তাবাদী বলিয়া দাবী করিতে পারে। পণ্ডিত জহরলাল বলেন তাঁহার অন্তরে কোন সম্প্রদায়েরই ছাপ নাই; তাহা হইলে মুস্লিম্লীগের সহিত হিন্দু হইয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা করিতে যান কোন সূত্রে? কংগ্রেসের কাগজগুলি মেয়েদের উপর সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামিকে হিন্দুসমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ না হওয়া ও বর্ণভেদের দোষের নাম দিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়া ঐ অনীতিকে ঢাকিতে চেষ্টা করে। আমরা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত ঐসব মন্তব্যে আসল বস্তুকে ঢাকা দিবার নীতিকে নিন্দা করি। হিন্দু সমাজের কোন প্রথা যদি মেয়েদের বিকাশ বিরুদ্ধ হইয়া থাকে সেজন্য আইন দ্বারা কিংবা সামাজিক আন্দোলন দ্বারা উহার সংশোধন আমরা সমর্থন করিব। কিন্তু মেয়েদের উপর যদি গুণ্ডামীর সমর্থন আরম্ভ হয় তবে উহা জাতীয়তাবাদের নীতি হইতে পারে না। মেয়েরা কি জাতির বাহিরের কোন বস্তু? বিকাশবিজ্ঞানে চিন্তা করিয়া দেখুন ইহা একজন নারীর পক্ষে কিরূপ বিকাশ বিরুদ্ধ

নীতির প্রশ্রয়। জাতীয়তাবাদের যদি কোন শক্তিশালী ভিত্তি থাকে তবে উহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে নারীর বিকাশের অনুকূল করিয়া আইন এবং সমাজের চিন্তা ধারা নিয়মিত করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা। আমরা ভাবিতেই পারি না, নারীরা এখনও কি করিয়া এই নপুংসক জাতীয়তাবাদের আশ্রয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। গান্ধিবাদীরা হিন্দু মহাসভার নাম শুনিলে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠেন। যুবকরা উঁহাদের প্রভাবে পড়িলে পাছে কংগ্রেসের নেতৃত্ব উপিয়া যায় সেই ভয়ে নেতারা ভীত। আমরা কংগ্রেসের বহু কার্য্যকলাপ ও নীতিকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে ইহা কোন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা ভাববাদী ও সাম্প্রদায়িক এবং ইহার বহু চিন্তা বিজাতীয় চিন্তার ভিত্তিতে স্থাপিত এবং অদূরদর্শী নীতির দ্বারা নিয়মিত। কংগ্রেসবাদীরা ভারতীয় চিন্তার মূলের কাছেও ঘেষেন নাই। ভারতীয় চিন্তায় বহু শক্তিশালী জাতীয় চিন্তার ভিত্তি আছে। উহা যদি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তবে আমরা বলিব শক্তিবাদ ঐরূপ জাতীয়তাবাদ চাহে না। কংগ্রেস এখন পাঁচ ও ছয় কলার নীতির দ্বারা পরিচালিত হিন্দু প্রতিষ্ঠান। ইহা যে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা ইহার বহু কর্ম্মে পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে। ইহার কর্ম্মনীতি হইতে হিন্দু মহাসভার কর্ম্মনীতি ও চিন্তাধারা অনেক উন্নত। উহাতে সাত কলার চিন্তার ভিত্তি আছে এবং ঐ চিন্তায় শক্তিস্তরের চিন্তার ভিত্তি বিপদগ্রস্ত হয় নাই। উহার আশ্রয়ে জাতীয়তাবাদ বেশী নিরাপদ। হয় কংগ্রেস তাহার নীতি বদলাইবে অথবা দেশবাসীর এক প্রকাণ্ড অংশের চিন্তা হইতে কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ন হইয়া যাইবে। কংগ্রেস যে শক্তিবাদ গ্রহণ করিবার শক্তি রাখে একথা আমরা বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছি না। আমরা হিন্দু মহাসভার নেতৃগণকে শক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া এবং এই ভাবে হিন্দু মহাসভাকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া জাতীয় মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইতে বলিতেছি।

৫০। যে সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প সেই সব প্রদেশে পাঁচ এবং ছয় কলার চিন্তার দ্বারা নিয়মিত কংগ্রেসের প্রভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন বিশেষ দুর্ব্বল হইবে। কংগ্রেস যেসব প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেই সব প্রদেশে কংগ্রেসের ভিতরের নীতি সাত কলার কর্ম্মবিজ্ঞান লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যে সব স্থানে হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প বলিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেখানে হিন্দুরা যদি সাত কলার চিন্তায় নিয়মিত হিন্দু মহাসভার আশ্রয়ে নিজেদের কৃষ্টি ও স্বার্থরক্ষা না করে তবে সেখানে পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তায় নিয়মিত কংগ্রেস তাহার সমর্থক হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িবে।

শক্তিবাদের দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা

৫১। (ক) শক্তিবাদ রাজতন্ত্র অস্বীকার করে না। রাজতন্ত্রের দ্বারাও শক্তিবাদের নীতি কেন্দ্রীয় শাসন নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা শক্তিবাদ স্বীকার করে। অতএব

বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট যেমন বৃটিশের শাসন ব্যবস্থা সম্রাটের অধীনে বৃটেনবাসীর প্রতিনিধিত্ব সূত্রে পরিচালনা করে, অন্য দেশের কোন মন্ত্রিসভার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই ঠিক সেইরূপ ভারতের মন্ত্রিসভা ভারতের প্রতিনিধিত্ব সূত্রে সম্রাটের অধীনে ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য এবং বৈদেশিক নীতির পরিচালনা করিতে স্বাধীন থাকিবে। ভারতের মন্ত্রিসভা এরূপ অবস্থায় স্থিত হইলে ভারত স্বাধীন হইল বলিয়া শক্তিবাদ স্বীকার করে।

(খ) বৃটিশ মন্ত্রিসভা বন্ধুত্ব সূত্রে ভারতীয় মন্ত্রিসভাকে পরামর্শ দিতে পারিবে; এবং ভারতীয় মন্ত্রিসভা যখন ইচ্ছা বৃটিশ মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া শুধু সম্রাটের অধীনে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিবার জন্য স্বাধীন থাকিবে। ভারতীয় মন্ত্রিসভার এইরূপ স্থিতি আসিলে শক্তিবাদ উহাকে স্বাধীন ভারত বলিয়া স্বীকার করিবে।

(গ) ভারত বৃটিশের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং স্বাধীন মন্ত্রিসভা গড়িবে। এরূপ স্বাধীনতাকে শক্তিবাদ স্বাধীন ভারত বলিয়া স্বীকার করে।

ভারত কী উপায়ে স্বাধীন হইতে পারে

৫২। বৃটেনের বিপদের সময় ভারতের জনগণের পরাধীন বিরোধী মনোবৃত্তি এবং শক্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া বৃটেন নিজের প্রয়োজনে ভারতকে লাগাইবার জন্য যদি মনে করে ভারতকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন তবে ভারত (ক) ও (খ) চিহ্নিত প্রকারের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। (গ) প্রকারের চিহ্নিত স্বাধীনতা ভারত বৃটিনের বিপদের সময় কোন ভীষণ যুদ্ধে বৃটেনের পরাভব ঘটিলে এবং ভারত সেই সময় শক্তিশালী চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে লাভ করিতে পারিবে।

৫৩। ভারত যদি শক্তিবাদ বুঝিতে না পারে এবং ভারত যদি পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তার স্তরে বদ্ধ থাকে তবে ভারত বৃটেনের বিপদেও তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে পারিবে না। বিপদকালে কিছু আদায় করিবার পক্ষে ছয় কলার চিন্তা কোন শক্তিশালী চিন্তাই নয় এবং পাঁচ কলার চিন্তার দ্বারা ভারত যদি বদ্ধ থাকে তবে ভারতের শক্তি দুইটা বিরুদ্ধ পন্থী দলে বিভক্ত হইয়া যাইবার দরুণ ভারত সুযোগ পাইলেও সুযোগ হারাইবে। পাঁচকলার চিন্তাবিজ্ঞানে লড়াই বাধাইলে দেশের একটা শক্তিশালী বৃহত্তর অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের পতাকা তলে দাঁড়াইয়া এই লড়াইয়ের মূলোচ্ছেদ করিবে। বৃটিশ যদি বিপদে না পড়ে তবে ভারত কখনও পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিবে না। আর বৃটেন যদি বিপদে পড়ে তবে বর্ত্তমান পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তাপুষ্ট কংগ্রেস শক্তিশালী কিছুই আদায় করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় ভারত যদি লড়াই বাধায় তবে কেবল

পরাজিতই হইবে না, জাতীয় শক্তির মূলে বিশেষ দুর্ব্বলতার বীজ বপন করিবে। এখন বৃটেন বিপদে পড়িলেও তাহাদের পক্ষে ভারতের সম্বন্ধ সূত্রে কোন ব্যতিক্রম হইবার ভয় তাহাদের নাই। তাহারা জানে ভারতের বর্ত্তমান চিন্তাবিজ্ঞান তাহাদের অনুকূলই আছে। কংগ্রেস যদি ছয় কলার চিন্তাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সাম্রাজ্যবাদের সহিত কোন সংঘর্ষ চাহে তবে শক্তিবাদী উহাতে যোগদান করিবে না। কারণ শক্তিবাদী জানে ঐ বিজ্ঞানে সংঘর্ষ বাধাইলে ভারতের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী অংশ দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। শক্তিবাদ জানে বর্ত্তমান চিন্তাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান-সমাজ ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করিবে না। কাজেই কংগ্রেস শক্তি-বিজ্ঞান না বুঝিয়া বর্ত্তমান চিন্তার ভিত্তিতে যদি সংঘর্ষ বাধায় তবে কংগ্রেসের বিশেষ ভুল হইবে। সংঘর্ষ বাধাইতে হইলে শক্তিশালী ভিত্তি লইয়া সংঘর্ষ বাধান কর্ত্তব্য। অহিংস সংঘর্ষ অপেক্ষা আবেদন নিবেদন শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি ভারতের মুক্তি যুদ্ধে এই অহিংস কর্ম্মবিজ্ঞান বিশেষ বিপদ সূচনা করিতেছে। এই মতবাদ মুছিয়া গেলেই ভারতের মঙ্গল হইবে।

শক্তিবাদের কর্ম্মপদ্ধতির বিভিন্ন দিক

৫৪। শক্তিবাদ বিজ্ঞান এমন সুন্দর ও উদার চিন্তাবিজ্ঞানে নিয়মিত কর্ম্ম-বিজ্ঞান যে ইহাকে একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় নীতি বলা যায়। ইহাকে যদি কোন রাষ্ট্র, দেশ, জাতি, সমাজ বা ব্যক্তি, রাষ্ট্রগত, দেশগত, জাতিগত, সমাজগত এবং ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করে তাহা হইলেও অসাম্প্রদায়িক শক্তিবাদীয় কর্ম্মবিজ্ঞানে ও চিন্তাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মীর সহিত উহাদের কর্ম্ম ও চিন্তার ভেদ হইবে না। অতএব প্রত্যেক রাষ্ট্র, দেশ, জাতি, সমাজ, সম্প্রদায়, শ্রেণী ও ব্যক্তি ইহাকে যে কোন গণ্ডীবদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিলেও ইহার ফলে তাহাদের কর্ম্ম কোন দূষিত কর্ম্ম হইবে না। কেহ যদি গণ্ডীবদ্ধ ভাবে এই শক্তিবাদ গ্রহণ করিতে চায় তাহা হইলে মূল শক্তিবাদী সঙ্ঘ তাহাদিগকে আরও সাহায্য ও উৎসাহিত করিবে। বলা প্রয়োজন ইহার দ্বারা সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না।

৫৫। শক্তিবাদবিজ্ঞানে শ্রেণী-সংঘর্ষ ও সোশিয়েলিজম্ আস্থরিকতার জন্মদাতা। পৃথিবীর বর্ত্তমান ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে ইহার দ্বারা কোন দেশেরই মঙ্গল সাধিত হয় নাই। যে কোন দেশেই ইহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করা হইয়াছে সেই সব দেশেই - দেশের লোককে দুইটা বিবাদমান বিরুদ্ধ দলে পরিণত করিয়াছে। ভারতকেও এই চিন্তা দুইটা বিরুদ্ধ দলে বিভক্ত করিয়া দিবে। আমরা বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের সমাজতন্ত্রীদিগকে একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে পারি যে তাঁহারা বাংলার কৃষকদিগকে যদি নিজেদের মতবাদ ধরাইতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহারা নিশ্চয় বিফল হইবেন। কৃষক শ্রেণীতে সাত কলার অপুষ্ট চিন্তা স্বভাবতঃই বেশী প্রস্ফুটিত থাকে। বাংলার কৃষকগণ বেশীর ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং মুস্লিম লীগ সাত কলার বিজ্ঞানে নিয়মিত চিন্তাধারা গ্রহণ করিবার দরুণ বাংলার মুসলমানগণকে সমাজতান্ত্রিকগণ

কিছুতেই সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বাহিরে আনিতে পারিবেন না। পাঁচকলার চিন্তা ও কর্ম্মনীতির সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা সাতকলার চিন্তায় নিয়মিত মুস্লিম লীগ ব্যর্থ করিয়া দিবে। মুস্লিম লীগ সাতকলার চিন্তা লইবার দরুন তাহাদের কর্ম্মধারা এমন সামঞ্জস্য ভিত্তি লইয়া অগ্রসর হইতেছে যে তাহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের ধনী, মধ্যবিত্ত এবং গরীবের চিন্তাধারাকে একই রেখায় নিয়মিত করিয়া চলিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি 'বিপ্লব' কর্ম্মীর কর্ম্ম লক্ষ্যের অনুকূল নহে। অতএব বাংলার সমাজতান্ত্রিকগণকে ঐ নীতি ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

শক্তিবাদের অর্থনীতি

৫৬। শক্তিবাদের মতে সব স্তরের মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও দুগ্ধের প্রাচুর্য্য হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি। কেন্দ্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত শক্তিবাদ এরূপ ব্যবস্থার জন্য যাহা করা প্রয়োজন তাহাই করিবে। উহা যদি কেন্দ্রীয় নীতি না করে তবে ঐ জন্য শক্তিশালী আন্দোলন করা শক্তিবাদের কর্ম্ম নীতির অন্তর্গত। শক্তিবাদ শ্রেণী-সংঘর্ষ সমর্থন করে না, কারণ উহা আসুরিকতার সমকক্ষ। ধনতন্ত্রবাদ এবং ধনসাম্যবাদের নামে মজুরতন্ত্রবাদও শক্তিবাদ সমর্থন করে না। ধনতন্ত্রবাদ বৈশ্যশাসন এবং মজুরতন্ত্রবাদ শূদ্র-শাসন। শক্তিবাদ ইহাদের কোনটাকেই সমর্থন করে না। শক্তিবাদ উৎপাদনের করণগুলিকে ষ্টেটের সম্পত্তি করা এবং ষ্টেট দ্বারা উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাতে শাসকদের দলের লোককে প্রতিপালন করার নীতিকে বিকাশ প্রতিকূল বলিয়া ঘোষণা করে। ইহা দ্বারা ষ্টেট আসুরিক ষ্টেটের সমকক্ষ হইতেই সুযোগ লাভ করিতে পারে। গরীবদের অন্ন বস্ত্র ও বেকারের কর্ম্মের সংস্থানের জন্য দেশের প্রয়োজনের অনুরূপ শিল্প উৎপাদনের পন্থা ষ্টেট প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহা কতকটা কুটীর শিল্পের অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে মানুষ যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণ সহ গ্রাম্যজীবন ও সামাজিক জীবনের সুখের মধ্যে অন্ন ও কর্ম্ম সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারে, ষ্টেট এ সব দিকেই বেশী দেখিবে। এজন্য বাহিরের শিল্প যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের শিল্প-শ্রী নষ্ট করিতে না পারে ষ্টেট সেরূপ ব্যবস্থা করিবে। জলসিঞ্চনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা গোপালন ও কৃষির বিরাট পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন। এইজন্য প্রথমটায় সেই সব প্রান্তই বাছিয়া লইতে হইবে যেখানে প্রচুর জমি চাষ ও আবাদের অভাবে পড়িয়া আছে। সে সব স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার মত কার্য্যকরী পরিকল্পনা করিবার প্রয়োজন। দেশের সর্ব্বত্র গোপালন করিবার জন্য প্রচুর গোচারণভূমির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান কংগ্রেস কর্ম্মীরা কৃষকদিগকে উস্কানি দিয়া জমিদারদের পিছনে লাগাইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের কর্ম্মনীতিতে জমিদারদের ক্ষতি করা এবং সুখী কৃষকদের সুখবৃদ্ধি করা ভিন্ন প্রকৃত বেকার এবং গরীবদের কোনই সুবিধা হইতে পারে না। এই জন্য শক্তিবাদ উহা সমর্থন করে না। জমিদারদিগকে এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রচুর গোচারণভূমির ব্যবস্থা করিয়া লইলে তাহাতে বেকারগণ গোপালনের দ্বারা অন্ন সংস্থানের সুযোগ করিতে পারিত এবং ইহার দ্বারা সমাজও বিশেষ উপকৃত হইত।

শক্তিবাদ গ্রাম্যশিল্প ও গ্রাম্যজীবন, গোপালন ও চাষের মধ্য দিয়া নিত্য নূতন পরিকল্পনার ব্যবস্থার জন্য এবং কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্রকে চাপ দিবার জন্য চারিদিক হইতে আন্দোলন করিতে বলিতেছে। কেন্দ্রীয় বিভাগে এইরূপ পরিকল্পনার উদ্ভাবন করিবার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ধনী শ্রেণীর উপর আয়কর শক্তিবাদ স্বীকার করিবে। মিলওয়ালাগণ মজুরদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা যাহাতে করিয়া দেয় সেই লক্ষ্যে আইন করা এবং মজুরগণ যাহাতে মিলওয়ালাগণকে এবং মিলওয়ালাগণ যাহাতে মজুরগণকে অকারণ বিরক্ত করিতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কর্ম্মীরা শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার দ্বারা দেশের চিন্তার ক্ষেত্র বিষাক্ত করিয়া দেয়, ইহা শক্তিবাদ সমর্থন করে না। বিদ্বেষ প্রচারে অপুষ্ট সাতকলার চিন্তা প্রশ্রয় পায়। দেশের বেকারদের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং তাহাদের কার্য্যের পন্থাও স্থির করিবার জন্য কেন্দ্রীয় নীতিকে চাপ দিবার আন্দোলন শক্তিবাদ সমর্থন করিবে। দুগ্ধ, অন্ন এবং বস্ত্রের প্রাচুর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি। ভারতে খুব সহজে উহা সম্ভব। ইহা শুধু শক্তিবাদেরই অর্থ-নীতি নহে; ইহা প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের বিষের ধারা আনিয়া প্রাচ্যের চিন্তা বিষাক্ত করিলে আমাদের সামাজিক সুখ বিপন্ন হইবে; শক্তিবাদ উহা সমর্থন করে না। প্রাচ্য চিন্তায় বহু সুন্দর উপাদান আছে। মানুষের সুখের জন্য উহার বিশেষ প্রয়োজন। বিকাশবিজ্ঞানে বৈষম্য অপরিহার্য্য। আমরা ইহাই জানি, একজন সাধারণ মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া একজন রাজা পর্য্যন্ত এবং একজন ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত যোগী পর্য্যন্ত সকলের শরীর, মন ও জ্ঞানপুষ্টির মত সর্ব্বপ্রকার উপাদান অন্ন এবং দুগ্ধের মধ্যে বিদ্যমান। উহার সচ্ছলতাই প্রকৃত অর্থনীতি। ধনসাম্যের নামে অকারণ বিদ্বেষ উদ্‌গীরণ কোন উন্নত আদর্শের লক্ষণ নহে। যাঁহারা কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা এদিকে নজর দিয়া বিদেশের শোষণজাল কি প্রকারে ছিন্ন করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করুন। কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য দেশের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধির চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়া দেশের মধ্যে চিন্তাধারার ঐক্য রক্ষা করিয়া চলা এবং দেশের বেকার ও অন্নসমস্যার সমাধানকে সামনে রাখিয়া বিদেশী শোষণের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করা।

গান্ধীবাদ ও শক্তিবাদ

৫৭। গান্ধীবাদ কি তাহা আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহই ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। শক্তিবাদ-বিজ্ঞানে ভাগ করিয়া উহা আমরা যথাস্থানে বুঝাইয়াছি। উহা আমাদের দেশের জাতীয়তা বাদীদের স্বীকৃত মতবাদ - যাহারা একদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং অন্যদিকে গুণ্ডাদের অনীতির প্রশ্রয় দেন। উহা মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে উৎসাহী। আবার হিন্দুরা ঐ ক্রমবর্দ্ধমান আব্দারে পেষিত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে সতর্ক হইতে চাহিলে উহাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘোষণা করিয়া যুবকগণকে দূরে রাখিবার যন্ত্রবিশেষে পরিণত মতবাদ। ইহা এমন এক চমৎকার মতবাদ যাহা নারীগণকে পর্দ্দা ত্যাগ করিয়া পথে আসিতে নির্দ্দেশ দেয় এবং

গুণ্ডাগণকে অত্যাচার করিবার সুযোগ দেয় এবং এই উভয়ের সামঞ্জস্য কি উহার বিজ্ঞান দিতে পারে না। উহা দ্বারা নিয়মিত কংগ্রেস এমন এক প্রতিষ্ঠান যাহা জমিদারগণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কৃষকদের পিছনে কর্ম্মীগণকে উস্কানির সম্মতি দেয় এবং ধনীগণকে নিজের কোলে আড়াল দিয়া রাখে। ইহা এমন এক মতবাদ যাহার অর্থনীতি, শাসননীতি ও সমাজনীতির কোনও সুনির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞান নাই। ইহা দ্বারা ভারত এক চমৎকার রামরাজত্বে পরিণত হইয়াছে। উহা চোরের দলকে চুরি করিতে প্রশ্রয় দেয় এবং ভাল গৃহস্থকে উহার দলে নাম লিখাইতে নির্দ্দেশ দেয়। উহার দ্বারা নিয়মিত কংগ্রেস একটা আশ্চর্য্য রকমের অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান যাহা মুসলমান সাম্প্রদায়িক আব্দারের নিকট হিন্দুদের পক্ষ হইয়া কথা কহিলেও উহা সাম্প্রদায়িক হয় না। উহা এমন এক চমৎকার মতবাদ যাহা মুসলমান শাসিত দেশীয় রাজ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন করিতে ভয় পায়, আবার হিন্দুশাসিত দেশীয় রাজ্যে স্বাধীনতার পৌরোহিত্য করিতে পারে। গান্ধীবাদের জাতীয়তা একটা এমন মতবাদ যাহা বীরত্ব ও ভীরুতার নমুনা একই চরিত্রে প্রতিভাত করিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতির সমর্থক। এই মতবাদের সবচেয়ে মজার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা হারিয়া যাওয়াকে বিজয় বলিয়া ঘোষণা করে। সত্য ও অহিংসার এই বিজয়ী মতবাদ কিরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছে ও ভাঁওতা দিয়াছে ও জাতীয় স্বার্থ হিংসা করিয়াছে ইহার প্রমাণ শত শত আছে। উহা শক্তিবাদের দৃষ্টিতে "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি না হইয়া পরিষ্কাররূপে "বর্জ্জন নীতি" হইলেই বেশী ভাল হইবে। ভারতের বুক হইতে ইহার প্রভাব মুছিয়া না গেলে ভারত আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এই চিন্তা নেতাগণকে এমন অদূরদর্শী করিয়া দিয়াছে যে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ভিত্তি করিয়া ইহারা আমাদের জাতি ও ভাষাকে পাশ্চাত্য করণের কর্ম্ম হাতে লইয়াছে। আমরা নেতাগণকে ইহাই বলিতে পারি যে, কামাল আতাতুর্ক হইবার যদি এতই সাধ তবে শক্তিবাদ বুঝিতে চেষ্টা করুন। বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া পশ্চিমীকরণের খেয়াল শীঘ্রই মুস্লিমলীগের পদাঘাতে চুর্ণ হইবে। ইঁহাদের আবিষ্কৃত হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দীর একটা চমৎকার ছুন্নতকৃত সংস্করণ। ইঁহাদের প্রত্যেকটি কার্য্যই শক্তিবাদীগণের উদ্বিগ্নের কারণ হইয়াছে। কংগ্রেস চায় আমাদের ভাষার বর্ণ বদ্লাইয়া আমাদের পূর্ব্বচিন্তা হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বঞ্চিত করিতে এবং হিন্দুস্থানী ভাষার নামে হিন্দুর জাতীয় চিন্তাকে মক্কা-মুখী করিতে। শক্তিবাদীরা ইহার বিরোধিতা করিবেন; কারণ কোন চিন্তাই যে ভারতীয় চিন্তার সমকক্ষ হইতে পারে না, ইহা শক্তিবাদীরা জানেন।

৫৮। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি গান্ধীবাদ ছয় কলার চিন্তা হইতেই আসিয়াছে। ইহার প্রয়োগ ক্ষেত্রও আছে। জগতে ইহার প্রয়োজনও আছে। ইহার স্থানে ইহাকে রাখিলে সমাজ ইহার দ্বারা বিশেষ উপকৃতই হইবে। কিন্তু গান্ধীবাদকে নিজের স্তর অপেক্ষা উন্নত মর্য্যাদা দিলে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ভারতের জাতীয় চিন্তায় এই দুর্ব্বলনীতি প্রবেশ করিবার জন্যই ভারত আজ প্রাদেশিকতার বিষে বিচ্ছিন্ন দশাপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই নীতির দোষই এই যে ইহা কথায় আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শ দেখায় কিন্তু

কার্য্যে ইহা মানুষকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেয়। ভারতে বর্ত্তমানে হিন্দুরাই এই নীতির দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রাদেশিকতা হিন্দুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী ও মহাসভাপন্থী, সবই হিন্দুদের জাতীয় শক্তির বিচ্ছিন্ন সংস্করণের নমুনা। একযুগে পৌরোহিত্যবাদ ভারতকে যে ভাবে ভাগ করিয়াছিল এযুগে গান্ধীবাদ উহা হইতেও বিচ্ছিন্ন দশার কারণ ঘটাইবে। এই বিশ্বাসবাদ ও আশাবাদের আলেয়ার পিছনে দৌড়াইয়া ভারত যদি শক্তিবিজ্ঞান না বুঝে তবে ভারতের সর্ব্বনাশ কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

৫৯। গান্ধিবাদকে "আন্তর্জ্জাতিকতার ভাঁওতাবাদ" নাম দেওয়া যায়। যাঁহারা জগদ্গুরু, আন্তর্জ্জাতিক মহাপুরুষ নামে পরিচিত হইবার স্বপ্ন দেখেন তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীস্থিত আস্থরিক সমাজগুলির সমর্থক হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যাঁহারা নিজের জাত ও নিজের সমাজের মঙ্গল করিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা ত্যাগ করিবেন।

সোশিয়েলিজম্ ও শক্তিবাদ

৬০। ইয়োরোপে সামন্ত তান্ত্রিক যুগে প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের দরুণ বিপ্লব আসে। সেই বিপ্লবে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। ফ্রান্স দেশে ইহার প্রথম বিপ্লব আসে। ইহাতে ভোটবাদের স্থাপনা হয়। ভোটবাদের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহার দ্বারা ধনী শ্রেণীর রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইহার ফলে শোষণবাদ প্রবল আকার ধারণ করে এবং বেকারের উৎপত্তি ও মজুরকৃষকের কষ্টবৃদ্ধি হয়। মানুষের কষ্ট উৎপত্তি হইবার দরুণ ধনসাম্যবাদের আবির্ভাব হয়। রুশ দেশে ইহার প্রথম বিপ্লব আসে। এই বিপ্লবের ফলে দলতন্ত্র রাজত্ব আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি বিপ্লবের ঋষির অদূরদর্শিতার জন্য বিপ্লবের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। ভোটবাদের ভোটারগণ বেশীর ভাগ মজুর ও কৃষক শ্রেণীর হইয়া থাকে। উহারা বিকাশে নিম্নতম বিকাশের মানুষ। উহাদের সংখ্যা সব স্তরের মানুষ অপেক্ষা বহু শতগুণ বেশী। ইহারা অল্প বিকশিত, তাই কম বুদ্ধিমান। কাজেই ইহারা ভোটই দেয়, কিন্তু মজা লুটে ধনীশ্রেণী। বিপ্লব যখন প্রথম আসে তখন জমিদার শ্রেণী কেন্দ্রীয় শাসনে ছিল। কাজেই যত দোষ ইহাদের নীতির উপর প্রযুক্ত হইয়া বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইহাদের চিন্তা ধনীশ্রেণী হইতে উন্নত হইলেও পৃথিবীতে ইহাদের বদনাম সবচেয়ে বেশী। সুতরাং ভোটবাদে ইহাদের স্থান না হইয়া ধনীদেরই প্রাধান্য বেশী হইতে বাধ্য। ধনসাম্যবাদের নামে যে বিপ্লব আসে উহাতে ভোটতন্ত্র যাইয়া দলতন্ত্র স্থাপিত হয়। ইহাতে বেকার সমস্যার সমাধান হয়। এই বিপ্লবের পূর্ব্বেই ইহাদের মতবাদ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। উহার ফলে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া বেকারসমস্যা ও মজুরপীড়নের বন্যা যাহা ভোটবাদে আসিয়াছিল উহার গতি বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ দেশে মন্দীভূত হয়।

৬১। ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দ্বারা রাজনীতিজ্ঞ রাজারা প্রজাতন্ত্রের আবরণে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু যে সব রাজা রাজনীতিজ্ঞতার অভাবে কম বুদ্ধিমান ছিলেন তাঁহারা প্রজাশক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া যান। রুশ বিপ্লবের পূর্ব্বে এবং পরে রাজতান্ত্রিক, এবং রাজাপ্রজা মিশ্রতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক দেশে বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। উহার ফলে ইহাই দাঁড়ায় যে বেকার ও গরীব সমস্যা যাহাতে ভীষণ আকার না ধারণ করে সেই দিকে সবার নজর পড়িয়া যায়। কাজেই মজুর বিপ্লবের গতিরুদ্ধ হইবার পথ হয়। প্রজাবিপ্লব এবং মজুর বিপ্লবের সপক্ষে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক ইতিহাস যুবক ক্ষেপাইবার জন্য আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিয়া অকারণ সময় নষ্ট করিতে চাহি না। এই সব বিজ্ঞান ভিত্তিহীন কাল্পনিক কথা। উহার প্রমাণ বিপ্লব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নূতন শাসননীতি দিয়াছে। আমাদের কথা, বিপ্লব বলিয়া কোন বস্তুই নাই। বাস্তবিক বিপ্লব হয় না। কেন্দ্রীয় শাসনের অনীতির জন্য দেবাসুর সংগ্রামই আসল কথা। কেন্দ্রীয় শাসন তাহার বিকাশনীতির দায়িত্ব পালন করিলে দেবাসুর সংগ্রাম আসে না। তাই শক্তিবাদ সংশোধন মানে, বিপ্লব মানে না। বিপ্লব যে আসুরিক শাসনের পতন আনিয়াছে ইহাই বিপ্লবের বাহাদুরি কিন্তু বিপ্লব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন আবার আসুরিক হইতেছে ইহাই বিপ্লবের অদূরদর্শিতার প্রমাণ। শক্তিবাদ বিপ্লব চাহে না, কিন্তু আসুরিক শাসনকে শাসাইয়া দিবার শক্তি রাখে। কেন্দ্রীয় নীতি দায়িত্বহীন হইলে উহার পতন অনিবার্য্য।

৬২। অস্ত্রধারী যে অস্ত্র ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয়নীতির জন্য যুদ্ধ করে উহার মূলে সে জানে যে মানুষের বিকাশের দায়িত্ব পালন করিতেছে। সে জানে ইহা তাহার বিকাশের অনুকূল এবং অখিল মানবের বিকাশের অনুকূল। সে যদি বুঝিত যে তাহার কেন্দ্রীয় শক্তি আসুরিক তবে সে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে ইহা তাহার দায়িত্বের প্রতিকূল, তাহার বিকাশের প্রতিকূল এবং অখিলমানবের বিকাশের প্রতিকূল। তখন কাহার সাধ্য তাহার দ্বারা অস্ত্র ধারণ করায়! এইরূপ প্রত্যেক বিভাগেই আমরা শক্তিনীতি অতি সহজেই ধরাইয়া দিতে পারি এবং কেন্দ্রীয়নীতি আসুরিকতা ত্যাগ না করিলে তাহার সমস্ত শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিতে পারি।

৬৩। কেন্দ্রীয়নীতি প্রজার দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া নিজের দায়িত্ব নষ্ট করিয়া আসুরিক হইয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রীয়নীতি শোষণ ও পীড়নের নীতির প্রশ্রয় দিয়াছিল। উহার ফলে ধনসাম্যবাদের উৎপত্তি হয় এবং রুশদেশে ঐরূপ বিপ্লব হয়। ফলে সমস্ত দেশেই কেন্দ্রীয় শক্তি সজাগ হইয়া গিয়াছে। সোশিয়ালিজম্ পৃথিবীতে যাহা আনিয়াছে উহাতে পৃথিবীতে দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং বেকারের উপর কেন্দ্রীয়নীতির দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলতান্ত্রিক দেশে বেকারসমস্যা নাই, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশ এ ব্যাপারে পিছনে পড়িয়া আছে। ধনতান্ত্রিক দেশে যাহাতে বিপ্লব না আসিতে পারে এজন্য বেকারের অন্ন-প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে। ধনসাম্য অসম্ভব। বিকাশের জন্য ধনসাম্যের কোনই প্রয়োজন নাই। বিকাশবাদী জানে যে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা বিকাশ লক্ষ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কেন্দ্রীয় নীতি যদি ইচ্ছা করে উহার সমাধান সহজ আর

কেন্দ্রীয় নীতি যদি উহা না করে তবে উহার পতন কঠিন নহে। শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় নীতির সংশোধনের জন্য জোর দিবে, বিপ্লবে নহে।

শক্তিবাদ ও ফ্যাসিবাদ

৬৪। রাজতান্ত্রিকতার স্থানে ভোটবাদ স্থাপিত হয়। ভোটবাদে ধনিকের শাসন আসিতে বাধ্য। ইহাই ধনসাম্যবাদের উৎপত্তির মূল। ধন-সাম্যবাদের নামে শেষকালে মজুর-তান্ত্রিকতার সৃষ্টি হয়। ধন-সাম্যবাদের নীতি মজুর-তান্ত্রিক রাজত্বেও ভাঙিয়া যায়। অধিকন্তু ঐ রুষদেশে একই মতবাদে দুইটা শক্তিশালী দল কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের শক্তি নষ্ট করিতে থাকে। এদিকে মজুর-তান্ত্রিকপ্রেমীরা প্রত্যেক দেশেই প্রবল হইয়া উঠে এবং ধন-তান্ত্রিক ও মজুর-তান্ত্রিক ভিত্তিতে অনেক দেশে দুইটা শক্তিশালী বিরুদ্ধ দলের আবির্ভাব হয়। মুসোলিনী ধন-তান্ত্রিকতায় বেকার সমস্যার অসমাধান এবং সোসিয়েলিজমের প্রাবল্যে একই দেশে দুইটা বিরুদ্ধ শক্তিশালী দলের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। ইহা যে কোন দেশের শত্রুর জন্য অনুকূল এবং দেশের শান্তির প্রতিকূল। তিনি দল-তান্ত্রিকতার সবলতা গ্রহণ এবং সোশিয়েলিজমের দুর্ব্বলতা বর্জ্জন দ্বারা ফ্যাসিজম্ নামক এক দলতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তি দেন। এই নূতন মতবাদ ধনতান্ত্রিকতা এবং মজুর-তান্ত্রিকতার বেষ্টনীর বাহিরে জাতিকে লইয়া যাইবার অনুকূল হয়। ধনতান্ত্রিকতা ধনীর অনুকূল শাসন এবং মজুর-তান্ত্রিকতা ধনীর উচ্ছেদের শাসন হইবার নিমিত্ত এই উভয় প্রকার শাসন তাঁহার চক্ষে দুর্ব্বল বলিয়া ধরা পড়ে। তিনি ধনী এবং মজুরের মোহের উপর দাঁড়াইয়া জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ফ্যাসিজমের জন্ম দেন। ইহাও দল-তান্ত্রিকতা। ইহাতে বৈশ্য-আস্থরিকতার উপর যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র সাজান আছে তেমনি মজুর আস্থরিকতার উপরও কড়া নজর আছে। ফ্যাসিজম্ ভোটবাদ উচ্ছেদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার সমাজব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নত স্তরের ভিত্তি লইয়াছে। রুষের নীতি এবং ইহাদের নীতির ফলে ইহাই ভেদ যে ফ্যাসিজমে ইটালী বা জার্ম্মানীর মত একটা দেশের মধ্যে রুষদেশের মত পরস্পর বিরোধী দুইটা দলের স্থান নাই। রুষদেশে যেমন বেকার সমস্যা নাই তেমনি ফ্যাসিষ্ট দেশেও বেকার সমস্যা নাই। রুষের শাসনবিরোধী খাঁটি সোশিয়েলিষ্ট-পন্থীরা আজ যদি বিলুপ্ত হয় তবে কালই রুষদেশের নীতি ও ফ্যাসিষ্ট নীতি একই রেখায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ষ্ট্যালিন এখন সোশিয়ালিষ্টপন্থী দলতন্ত্রী* হইয়াছেন। ফ্যাসিষ্ট-পন্থীরা সোশিয়েলিষ্ট-পন্থী অপেক্ষা উন্নত নীতির ভিত্তি লইয়াছে। একথা সত্য হইলেও উহারা যে বিদেশের জন্য আস্থরিক উহা স্বীকার করিতেই হইবে। দল-তন্ত্রী এবং ভোটবাদী দেশে ইহাই ভেদ যে ভোটবাদীদের দেশে বেকার সমস্যা আছে কিন্তু দল-তান্ত্রিক দেশে উহা নাই। ফ্যাসিষ্ট নীতির সহিত যদি আমরা শিবস্তরের (আটকলার) জ্ঞান-শক্তি মিলাইয়া লইতে পারি তবে উহা শক্তিবাদের সমকক্ষ নীতি হইবে। কিন্তু সোশিয়েলিষ্ট নীতির সহিত আট কলার নীতি যোগ করিবার কোনই পথ নাই। কারণ সোশিয়েলিষ্ট নীতি অত্যন্ত অপুষ্ট কলার দ্বারা নিয়মিত মতবাদ। উহা

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের "সমাজতন্ত্রী" স্থানে "দলতন্ত্রী" গৃহীত হল।

আপনিই বিলুপ্ত হইবে। ভোটবাদী বা ধন-তান্ত্রিক, মজুরদল-তান্ত্রিক বা সোশিয়েলিষ্ট এবং ক্ষাত্র-দল-তান্ত্রিক বা ফ্যাসিষ্ট এই তিন প্রকার মতবাদের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট পন্থীরা বেশী শক্তিশালী। সোশিয়েলিজম্ নিজের দেশে আস্থরিকতার জন্মদাতা। ইহা অত্যন্ত বিদ্বেষ মনোবৃত্তির জন্মদাতা মতবাদ। সোশিয়েলিজম্‌কে বিদ্বেষবাদী মতবাদ বলা যায়। ইহা শক্তিবাদীর কাম্য হইতে পারে না। ফ্যাসিষ্টরা অত্যন্ত দাম্ভিক। ইহার সহিত আট কলার জ্ঞানশক্তি মিলিত হইলে ইহাতে এই দুর্ব্বলতাটুকু থাকিত না। সোশিয়েলিজমের আড়ালে থাকিয়া ষ্ট্যালিন যাহা চালাইতে চাহেন, উহাতেও শক্তিবাদ আসিতে পারে কিন্তু খাঁটি সোশিয়েলিজমের সহিত শক্তিবাদ খাপ খাইতে পারে না। ফ্যাসিজম্ জাতীয়তাবাদী হইতেও অন্য জাতির স্বাধীনতা নষ্ট করিবার পক্ষপাতী। ইহাকে জাতীয়তাবাদের আদর্শ বলা যায় না। শক্তিবাদে উহা হয় না।

শক্তিবাদে নারীর স্থান

৬৫। শক্তিবাদ নারীর পর্দ্দা প্রথা সমর্থন করে না। উহা ভারতীয় কৃষ্টির বিরোধী। সামাজিক জীবনে নারীগণের বিকাশের ত্রিবিধ ভাবধারা আছে। কন্যা ভাব, স্ত্রীভাব এবং মাতৃভাব। পশ্চিমের ভাবধারা নারীকে স্ত্রীত্বে পরিণত করিয়াছে। নারীর কর্ম্ম-জীবনে স্ত্রীত্বকে ব্যাপক করিয়া দেখিবার রীতি ভারতীয় চিন্তার অনুকূল নহে। উহা নারীদেরও বিকাশের অনুকূল নহে। পশ্চিমের চিন্তা নারীকে অত্যন্ত সংকোচ স্থানে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মাতৃত্বের সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য দুই বেশী। এই ত্রিবিধ ভাব জগতের পরেও নারীর স্থান আছে। উহা জ্ঞান ও নিষ্কামকর্ম্মের জগৎ। নারীর সেখানেও অধিকার আছে। শক্তিবাদ সামাজিক জীবনে নারীর প্রয়োজন পুরুষ হইতে একটু অন্যরূপ বলিয়া স্বীকার করে। সেই সঙ্গে শক্তিবাদ ইহাও স্বীকার করে যে রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর মর্য্যাদা পুরুষের সমান। শক্তিবাদ সহশিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে না। নারীর বিকাশের অনুকূল সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য নারীর অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। নারীদের জন্য বিশিষ্ট কতকগুলি বিভাগের কাজ সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হইতে পারে। শক্তিবাদ যন্ত্রমিশ্রিত গ্রাম্য কুটিরশিল্পের মধ্য দিয়া নারীর অর্থোপার্জ্জনকে সমাজের বিকাশের বেশী অনুকূল বলিয়া সাব্যস্ত করে।

৬৬। কংগ্রেসের বর্ত্তমান চিন্তাধারা দুর্ব্বল হইবার দরুণ জাতির এই জাগরণের দিনে নারীর মর্য্যাদা অত্যন্ত কদর্য্য ভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। একজন ইংরাজ মহিলা একাকী আমাদেরই দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদিগকে গুণ্ডারা ঘর হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে সাহস পায়। গুণ্ডারা জানে আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা নারীর মর্য্যাদা জানে না। কিন্তু একটি ইংরাজ মহিলার পিছনে তাহারা তাহাদের জাতীয়তার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি একমুখী করিয়া রাখিয়াছে। নারীর পর্দ্দাপ্রথা রহিত করিবার জন্য যাঁহারা আন্দোলন করেন তাঁহারা সমাজে ও আইনে গুণ্ডাবিরোধী কোন নীতি স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই কেন, ইহা

আমাদের নিকট আর অপরিস্ফুট নাই। দেশের প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য সর্ব্বত্র শক্তিসঙ্ঘ স্থাপনা করিয়া নিজেদের মর্য্যাদার অনুকূল সামাজিক চিন্তা ও আইনের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করা। নারীর মর্য্যাদা সর্ব্বত্র মায়ের মত পবিত্র হইবে। শুধু এই জন্যই এখন নারীদের আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হওয়াই স্বাধীনতা। ইহা ভিন্ন স্বাধীনতা কাহাকে বলে উহা শক্তিবাদ জানে না। নারীর জন্য গুণ্ডার প্রাধান্য কখনও স্বাধীনতা হইতে পারে না। কংগ্রেস উহার প্রশ্রয়দাতা। ইহা শক্তিবাদ একবাক্যে প্রচার করিতেছে। একজন নারীর মর্য্যাদার জন্য সমস্ত নারীকে একমত হইতে হইবে। মুসলমান সমাজ নেতৃত্বে সাত কলার চিন্তার ভিত্তি আছে, সুতরাং সেখানে নারীরা অত বিপদগ্রস্ত নহে। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দুগণকে ছয় কলার চিন্তায় নামাইয়া দেওয়ার দরুণ হিন্দুনারীরা অসহায় হইয়া দিয়াছে। হিন্দু মহাসভা গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে না আসিলে হিন্দু নারীর আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারে না। শক্তিবাদ বিজ্ঞানের ইহাই নিয়ম যে বিকাশের পথ করিবার জন্য যে দিক হইতে শক্তি পাওয়া যায় সেইদিকেই ঝুঁকিতে হইবে। জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়াইয়া যাহারা নারীর অপমানের পথ করিয়া দিয়াছে তাহাদের কথায় এখন না ভুলিয়া প্রথম গুণ্ডাদের হাত হইতে নিজেদের মুক্তির পথ করিতে হইবে। শক্তিবাদ গ্রহণ করিলে সাম্প্রদায়িকবাদ কাহাকেও মলিন করিতে পারে না।

শক্তিবাদ ও মুসলমান সমাজ

৬৭। ঋষির নির্দ্দেশের স্থানে পুরোহিতনির্দ্দেশ যে যুগে ভারতের শাসক ও সমাজের পতন সূচনা করিয়াছিল, সেই যুগে ভারতে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। সমাজ নীতি পূর্ব্বেই পৌরোহিত্যবাদের কঠোর পীড়নে শক্তিহীন হইয়াছিল। মুসলমান শাসকবর্গ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া একটা প্রকাণ্ড অংশ দেশবাসীকে নিজেদের সমর্থক করিবার জন্য নিজেদের সমাজভুক্ত করিয়া লয়। শাসকগণের শিক্ষা ও দীক্ষায় ইহারা মুসলমান শাসকগণের সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমান সভ্যতা পৃথিবীর যে কোন দেশেই প্রচারিত হইয়াছে, সেই দেশেরই এক অংশ লোককে তাহারা মুসলমান শাসকদের অনুকূল এবং সেই দেশের জাতীয় সভ্যতার প্রতিকূল করিয়া গড়িবার জন্য আরবী অক্ষর ও আরবীয় ভাষার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে। ভারতে মুসলমান শাসনের প্রভাবের সঙ্গেও তাহাদের এই নীতির অপলাপ হয় নাই। আমাদের দেশের মুসলমান শাসকগণ বহুদিন আরবীয় অক্ষর ও কৃষ্টির ভক্ত হইবার দরুণ তাহাদের জাতীয়তাবাদে শ্রদ্ধা কম। তাই তাহারা ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে নিজেদের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে শক্তি পায় না। মুস্‌লিম্‌ লীগ মুসলমানদের একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহা এদেশবাসী মুসলমানগণকে জাতীয়তাবাদের হাওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শক্তিশালী উদ্যমের আশ্রয় লইয়াছে। ভারতের জাতীয় নেতারা এতই দুর্ব্বল চিন্তায় মুগ্ধ যে ইহাদিগকে জাতীয়তাবাদের হাওয়া দিবার জন্য ইহাদের যত প্রকার সাম্প্রদায়িক আব্‌দার মানিয়া লইয়াছে। তুরস্ক বীর কামাল আতাতুর্কের মত বীর জাতীয়তাবাদী কোন

শক্তিমান পুরুষ আমাদের দেশের মুসলমান সমাজে যদি জন্মগ্রহণ করেন তবে এই আরবমুখী সম্প্রদায়ের চিন্তাশক্তি নিজেদের জাতীয় কৃষ্টির দিকে ঘুরাইয়া দিতে পারিবেন। কংগ্রেসবাদীদের মধ্যে কাহারও সেই শক্তি নাই। আতাতুর্ক দেশের জাতীয় চিন্তার আরবমুখী গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য একদিনে নিজের দেশ হইতে আরবী অক্ষরের বহিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বিজাতীয় আরবীয় কৃষ্টিকে নিজের জাতীয় কৃষ্টির তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের আরবীয় নাম 'কামালপাশা' ত্যাগ করিয়া 'কামালআতাতুর্ক' নাম গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের মুসলমানদের মতিগতি ও চিন্তাশক্তি কত দুর্ব্বল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সর্ব্ববিষয়ে ইহারা কত পশ্চাদ্‌পদ ইহার সমালোচনা করিতে চাহি না। ইহারা আপনাদিগকে ভারতীয় কৃষ্টি ও জ্ঞান হইতে আলগা করিয়া অর্থাৎ নিজেদের জাতীয় কৃষ্টি ত্যাগ করিয়া আরবীয় কৃষ্টি ও জ্ঞান সম্পদের সহিত যুক্ত হইতে চাহে। যে জাতের কৃষ্টি ও জ্ঞান সমুদ্রের মত অনন্ত এই জাত উহা ত্যাগ করিয়া বিন্দুর জন্য লালায়িত হইয়াছে। ইহারা ইহাদের পরবর্ত্তী পুরুষের কী ক্ষতি করিল ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী পুরুষই দিতে পারিবে। অবশ্যই ভারতের বুকে শক্তিবাদের কর্ম্মনীতি না দাঁড়াইলে এবং গান্ধীবাদই যদি ভারতের জাতীয় চিন্তার ভিত্তি থাকে তবে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে থাকিয়াও ইহারাই রাজনৈতিক ভারতের শক্তিশালী অংশে পরিণত হইবে। ইহারা যতদিন আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া আলগা করিয়া রাখিতে চাহে, ততদিন তাহাতে বাধা দিবার নীতি শক্তিবাদীরা ত্যাগ করিবেন। ইহাদের সম্প্রদায়ে পাঁচ ও ছয় কলার চিন্তার প্রভাব বর্ত্তমানে কম থাকিবার দরুণ কোন উন্নত চিন্তাশীলের চিন্তাই ইহাদের সমাজে সহজে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। সাম্প্রদায়িক হওয়া কোনই খারাপ বস্তু নয় কিন্তু কোন সম্প্রদায় যদি অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা বেশী সুবিধার জন্য ঝগড়া বাধাইতে চায় তবে উহাকে শক্তিবাদের দৃষ্টিতে আসুরিক নীতি বলিতে হইবে। কোন সম্প্রদায়েরই তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবী মানা দুর্ব্বল নীতির অন্তর্গত। উহা শক্তিবাদী নীতি নহে। আমরা মুসলমান সমাজকে ইহাই বলিতে পারি যে তাহারা যদি শক্তিবাদের চিন্তা গ্রহণ করে তবে উহা তাহাদের সম্প্রদায়ের বিকাশের অনুকূলই হইবে এবং তাহাদের চিন্তার যে দুর্ব্বলতা - অন্য সমাজের জন্য ভাবিতে পারে না - উহাও ইহার প্রভাবে দূর হইবে। আমাদের মনে হয় মুসলমান সমাজ কোন উন্নত চিন্তা ও কৃষ্টি গ্রহণ করিবার মত শক্তি এখনও যথেষ্ট অর্জ্জন করে নাই। কাজেই এইজন্য বেশী শক্তি ক্ষয় না করিয়া শক্তিবাদীরা অগ্রসর হইয়া চলিবেন। যখন একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শক্তিবাদের ভিত্তি লয় তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উহা না লইয়া দাঁড়াইতেই পারে না। একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নিকট আসুরিক নীতি ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি রাখে না। কাজেই মুসলমান সমাজ হয় শক্তিবাদ গ্রহণ করিবে অথবা দেশের কোন অনুন্নত সম্প্রদায়ের মত স্থান গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

শক্তিবাদ ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়

৬৮। উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদিগকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব ইতিহাস লিখিয়াছেন উহা আমাদের প্রাচীন কোন শাস্ত্রই সমর্থন করে না। আর্য্যেরা পশ্চিম দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং দেশের আদিম অধিবাসীদের পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে অছ্যুত করিয়া রাখিয়াছে, এরূপ ইতিহাসকে শক্তিবাদ মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া ঘোষণা করে। উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা এবং এদেশের মুসলমানেরা সকলেই আর্য্যসন্তান এবং ভারতসন্তান। উন্নত বা অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু, আর্য্য বা অনার্য্য নাম সব একই আর্য্য সভ্যতার অঙ্গীভূত কথা। আদি যুগে যে আট কলার বিকাশসম্পন্ন ও চার কলার বিকাশসম্পন্ন মানুষের কথা বলা হইয়াছে ইহাদের উভয়েরই সভ্যতা প্রায় এক প্রকারের। অষ্টম কলার বিকাশ হইতেই মানবের উৎপত্তি। এই মানবই আদি মানব। ইহাদিগকে ঋষি বলা হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত মানবই এই ঋষিসন্তান। ঋষির প্রথম আবির্ভাব ভারতে হইয়াছিল। এখান হইতে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহাদের বংশধরগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে ঋষিসন্তান বহুদিন এই আদি সভ্যতার কাঠামো ধরিয়াছিলেন। এই যুগটাই আমাদের বৈদিক যুগ বা শিবের যুগ। সামাজিক যুগে সামাজিক সভ্যতার স্থিতি ও ভঙ্গ লইয়া ঋষিসন্তানগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যাহারা সামাজিক সভ্যতা ধরিয়াছিল তাহাদিগকে আর্য্য বলা হইত এবং যাহারা সামাজিক সভ্যতা ভঙ্গ করিয়াছিল তাহাদিগকে অনার্য্য বলা হইত। সকলের সহিত সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে ইহাই সামাজিক সভ্যতার বিজ্ঞান। উহা না করিয়া যাহারা অকারণ অশান্তি বাধাইত তাহারা সে যুগের জ্ঞানিগণের ভাষায় অনার্য্য বলিয়া তিরস্কৃত হইত। সামাজিক সভ্যতার যুগে সমাজের গঠন এবং সমাজপতির সৃষ্টি আর্য্য এবং অনার্য্য দুই দিকেই হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কখনও কখনও ঝগড়ারও সূত্রপাত হইত। ইহার ফলে পরবর্ত্তী সময় কর্ম্মের ভাগ বাঁটোয়ারার স্বাভাবিক পরিণতিতে চার বর্ণের উৎপত্তি হয়। এপর্য্যন্ত ঋষি সন্তান পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল; ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অনার্য্য। ইহারা সকলেই একই বৈদিক সভ্যতার অন্তর্গত। ইহার পর সমাজব্যবস্থা সম্বলিত শাস্ত্রের (স্মৃতি শাস্ত্রের) উৎপত্তি হয়। উহার নীতি অমান্য হইবার দরুণ আর্য্যসমাজ আরও বহুপ্রকার ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বিবাহ এবং বৃত্তিব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা ছিল। বিবাহ প্রথার একটা প্রধান কথা ছিল, বিলোম বিবাহ হইতে পারিবে না। উহা ভঙ্গ হইয়া পঞ্চম জাত হয়। ইহাদিগকে এবং অনার্য্য শ্রেণীর ঋষিসন্তানগণকে বর্ত্তমান স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদীদ্বারা পোষিত ঐতিহাসিকগণ এদেশের আদিম নিবাসীর থাকে ফেলিয়াছেন। আমরা এরূপ ইতিহাসকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। ভারতের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার চেষ্টা হইতেছে। কংগ্রেসের চিন্তা আমাদের জাতীয় চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া বিদেশীয় ভিত্তি লইয়াছে। অতএব এই ইতিহাস সংশোধনের জন্য আমরা হিন্দু মহাসভাকে আন্দোলন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। সামাজিক শাসনের ফলে অস্পৃশ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার মূল বিজ্ঞান এইরূপ : ব্রাহ্মণ কন্যা ও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্রের পুত্র মিলিত হইলে উহা

পঞ্চম জাত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্য বা শূদ্রের মিলনে পঞ্চম জাত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কন্যা এবং শূদ্রের পুত্র মিলনে পঞ্চম জাত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকন্যা ও পঞ্চমজাত পুত্র মিলনে পঞ্চম জাত। পঞ্চম জাতের পুত্র ও পঞ্চম জাতের কন্যা মিলনে পঞ্চম জাত। ভারতে ঋষিসন্তানগণের সামাজিক ভেদের ইহাই ইতিহাস। ইহাতে সামাজিক শাসনের যে সূত্র আছে উহাতে কোন শাস্ত্রেই বর্ত্তমান অনুন্নতগণকে আর্য্য সভ্যতার বাহিরের কোন জাত বলা হয় নাই। অনার্য্য বলিয়া যে সব ঋষিসন্তান তিরস্কৃত হইয়াছে তাহাদের সকলেই ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বলিয়া মানা হয়। সকলেরই গোত্র আছে, বৈদিক সংস্কারের অধিকার আছে। সকলেই বেদ ও ঋষি মানে। শাস্ত্রও ইহার সমর্থন করে। সামাজিক শাসনের ফলে যাহারা সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহারা এবং সভ্য শাখার ঋষিসন্তানগণ দুই জাত নহে। ইহাদের দুই সভ্যতাও নহে। প্রথম যুগে যাহারা পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মিলনের সূত্রপাত হইত তাহাদের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার বহু বিষয়ে আদান প্রদান হইয়াছিল। এখন উহার চিহ্ন স্বরূপ বহু প্রমাণ আমরা বাহির করিতে পারি। কিন্তু যাহাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পর বহু যুগ মিলন ঘটে নাই তাহাদের ভাষা ও ভাবের সহিত আমাদের ভাবের স্বাভাবিক সম্পর্ক কম। যাহা হউক সামাজিক শাসনের যুগে এবং এখনও সামাজিক শাসনের ফলে অনুন্নত শ্রেণীর উৎপত্তি হইতে পারে। উচ্চ বংশের কন্যা এবং হীন বংশের পুত্র হইলে কোন নীচতার লক্ষণ ইহা মানা যায় না। শক্তিবাদও উহা স্বীকার করে না। আমরা ইহাই বলিতে পারি উহা আমাদের এক সময়ের সভ্যতার রীতি ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর অর্থের সচ্ছলতা ফিরিয়া আসিলে তাহারা নিজেরাই ইহা সকলকেই বুঝাইতে পারিবে এবং নিজেরা ইহা বুঝিতে পারিবে। সামাজিক শাসনের পর রাজশাসনের যুগে যেরূপ শাসন হইয়াছিল উহাকে সাত কলার (বিষ্ণু স্তরের) দুর্ব্বল শাসন, বিষ্ণুস্তরের আস্থরিক শাসন এবং শক্তিস্তরের শক্তিশালী শাসন; এরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শাসন দুর্ব্বল বা আস্থরিক হইলেই নানা প্রকার গোলমাল হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ আছে। ইহাই দেবাস্থর যুদ্ধের ইতিহাস। দেব, অস্থর, আর্য্য ও অনার্য্য ইত্যাদি শব্দ ধরিয়াই বাহিরের জাত, ভিতরের জাত প্রমাণ হয় না। আমাদের শক্তিস্তরের কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে কর্ম্ম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত উহার সহিত অনুন্নত শ্রেণীর যে কি সম্পর্ক উহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সেই মতে আমরা বলিতে পারি উন্নত এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোক একই সভ্যতা, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সমাজের লোক। ধর্ম্মস্থানে ও ধর্ম্মকার্য্যে ইহাদের সহিত উন্নত সমাজের সমান অধিকার শক্তিবাদী মাত্রেই পালন করিবে। বিবাহ সমাজব্যবস্থার কথা, অন্নচলন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা; উহা লইয়া শক্তিবাদীরা উদাসীন থাকিবে। মন্দিরপ্রবেশ ব্যাপারে এবং সমাজে ইহাদের উপর অপমানকর ব্যবহারকে আইন দ্বারা প্রতিকার করা প্রয়োজন। উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা পরস্পরের সুখে দুঃখে এবং আপদে বিপদে উভয়ে উভয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইবে এবং একে অন্যের জন্য লড়াই দিবে এবং ধর্ম্মস্থানে সমান অধিকার পাইবে, শক্তিবাদীর মতে হিন্দুর একতা বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। শক্তিবাদ অন্নচলন ও বিবাহকে একতার কোনও সূত্র বলিয়া মানে না। একই বিজ্ঞানের কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়া একই

আদর্শের লক্ষ্যে লড়াই দেওয়া প্রকৃত একতা। একই কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধর্ম্মের অধীনে থাকা একতার দ্বিতীয় অংশ। বিবাহ ও অন্ন চলনের একতাকে কোন একতাই স্বীকার করা যায় না। ইহা লইয়া যাহারা কচাকচি করিতে চাহেন করুন; শক্তিবাদী উহাতে ভাগ লইবে না।

শক্তিবাদ ও দেশীয় রাজ্য

৬৯। শক্তিবাদ রাজতন্ত্রের প্রশংসাই করে কারণ উহা খুব সহজে শক্তিস্তরের শাসনে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগ প্রজাতান্ত্রিক যুগ। প্রজারা চাহে কিছু কর্ত্তৃত্ব করে। ইহাকে দেশীয় রাজাগণ উৎসাহিত করিলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। দেশীয় রাজাগণ নিজেদের মন্ত্রিসভায় প্রজাতন্ত্রের স্থাপনা করিলে রাজাদের শক্তি ও স্থিতি বিশেষ শক্তিশালী হইবে। বর্ত্তমান সময়ে রাজারা সাম্রাজ্যবাদীদের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রজার সমর্থন তাঁহাদের পিছনে থাকিলে তাঁহারা নিজেদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কংগ্রেসের নীতিকে ত্যাগ করিয়া দেশীয় প্রজাগণ রাজতন্ত্র মিশ্রিত প্রজাতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করুন। আমরা হিন্দু মহাসভা ও মুস্লিম লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানকেই দেশীয় প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য শক্তিবাদবিজ্ঞানে দেশীয় প্রজাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাদের মধ্যে শক্তিবাদ প্রচারের চেষ্টা করুন। ইহাদ্বারা রাজা প্রজা দুই দিকেই উপকৃত হইবেন।

শক্তিবাদ ও হিন্দুমহাসভা

৭০। হিন্দুমহাসভাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া কংগ্রেস নেতারা কোণঠ্যাসা করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা হিন্দুমহাসভাকে শক্তিবাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। শক্তিবাদ কোন সাম্প্রদায়িক কর্ম্ম-বিজ্ঞান নহে। ইহা ভারতীয় কৃষ্টি ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রকৃত জাতীয়তাবাদ। ইহা গ্রহণ করিয়া যে কোন সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার নষ্ট না করিয়া নিজের সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে পারে। হিন্দু মহাসভাকে কোণঠ্যাসা করিবার দরুণ কংগ্রেস নিজে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মহাসভা নিজের গঠনতান্ত্রিক নিয়মে, "ভারত যাহাদের জন্মভূমি ও পুণ্যভূমি তাহারাই হিন্দু" এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে। কিন্তু কোন মুসলমান যদি মহাসভার সভ্য হইতে চাহে তবে তাহাকে সভ্য করা যায় না। একাধারে এই উদারতা এবং অনুদারতার বিরুদ্ধ নিয়ম বোধ হয় গান্ধীবাদীগণকে মহাসভায় প্রবেশে বাধা দিবার জন্যই আবিস্কৃত হইয়া থাকিবে। গান্ধীবাদের দুর্ব্বল চিন্তা যাহাতে মহাসভাকেও আন্তর্জ্জাতিক ভাঁওতাবাদীদের একচেটিয়া রাজত্বে পরিণত করিতে না পারে এজন্য মহাসভার এই নিয়মতান্ত্রিক বাঁধন উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ আন্তর্জ্জাতিক ভাঁওতাবাদীরা আপনাদিগকে এত কুলীন মনে করেন যে সাম্প্রদায়িক (?)

প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া ইঁহারা যে কিছুতেই নিজেদের কৌলিন্য মর্য্যাদা নষ্ট হইতে দিবেন না ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু মহাসভার গঠনতান্ত্রিক নিয়মে যদি শক্তিবাদকে স্থাপন করা যায় তবে মহাসভার ঐ অনুদারতাকে সহজেই পুঁছিয়া দেওয়া যায়। মহাসভার মধ্যে যখন নানা রকম বিরুদ্ধ আচার বিচারে অভ্যস্ত বহু সম্প্রদায় স্থান পাইয়াছে তখন হিন্দুস্থানী মুসলমানেরাও উহাতে স্থান পাইতে পারিত। শক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া মহাসভার ইচ্ছা হয় তো সব দিকেই সামঞ্জস্য করিতে পারে। অবশ্যই এজন্য পীড়াপীড়ি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহাসভা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইয়াও শক্তিবাদ গ্রহণ করিলে জাতীয় কল্যাণের অনুকূল হইবে।

৭১। হিন্দু মহাসভাকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসবাদ নহে। মুসলমান ধর্ম্ম আমাদের দেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে যত প্রকার মতবাদ ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে সকলের স্থান ইহাতে আছে। হিন্দু সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহা বৃত্তিবিভাগ ও বিবাহপ্রথার ভেদ লইয়া অবস্থিত একটা বিরাট রাষ্ট্রের দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম। হিন্দুরা এদেশের সর্ব্বপ্রকার কৃষ্টি ও সভ্যতার উপাদান লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কংগ্রেস বিদেশীয় চিন্তার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দিতে যাইয়া আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। কংগ্রেসের একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা এই যে ইহারা পশ্চিমের চিন্তার ভিত্তি ধরিয়া এখানে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং পশ্চিমের ভিত্তিতে ঐ সমস্যার সমাধান করিতে চায়। কংগ্রেসের চিন্তা ভারতের একটা প্রকাণ্ড উপকার ইহাই করিয়াছে যে ইহা আমাদের জাতীয় চিন্তা হইতে পৌরোহিত্যবাদের প্রভাব নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। এইজন্য চিন্তাশীল মাত্রেই ইহার প্রশংসা করিবে। হিন্দুমহাসভার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা আজ পর্য্যন্ত কখনও জাতীয় আন্দোলনের বাহিরে যায় নাই। ইহা সব সময় সাম্রাজ্যবাদের অনীতির বিরোধিতা করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের পিছনে কোন শক্তিশালী চিন্তাবিজ্ঞান না থাকিবার দরুণ ইহারা যে পদে পদে ভুল করিবে ইহাতে কোন সংশয় নাই। কাজেই শক্তিবাদীরা হিন্দু, মুসলমান, কংগ্রেস ইত্যাদির মোহ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদের পথ ধরিয়া সকলকে সংশোধনের চেষ্টা করিবেন। কংগ্রেস সব ক্ষেত্রেই অহিংসার আদর্শ রক্ষা ভিন্ন জাতির প্রতি কোন শক্তিশালী দরদ দেখায় নাই। হিন্দুর উপর গুণ্ডামী, অনাচার, অত্যাচার, নারীর অপমান সবই ইঁহারা প্রশ্রয় দিয়াই চলিয়াছেন। আজ বাংলাদেশে হিন্দুরা কিরূপ অসহায় হইয়া দিয়াছে ইহা প্রত্যেকটি বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। কংগ্রেস বাংলার অসহায় অবস্থার মূলে অবস্থিত। আজ বারদৌলীতে মহাত্মাজী অহিংসার বিজয় স্তম্ভ স্থাপনার আয়োজন করিতেছেন। একি একটা জাতীয় বিজয় চিহ্ন? কোন বিজয়ী জাতিকে তাহার বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ এরূপ কমিউনেল অ্যাওয়ার্ড কেহ দিতে পারে কি? যদি ইহা সত্যই বিজয় তবে বিজিত বিজয়ীকে এইরূপ কনষ্টিটিউসন দিতে পারে কি? সীমান্তে হিন্দুদের উপর যে অনাচার হইতেছে, ইহার জন্য ওখান হইতে হিন্দুগণকে সরিয়া আসিবার নির্দ্দেশ ভিন্ন এই বিজয়ের পুরোহিত কোন শক্তিশালী আত্মরক্ষার পরামর্শ ঐখানের কংগ্রেসী সরকারকে দিয়াছিলেন কি? বিজয়ের যদি ইহাই নমুনা হয় তবে আত্ম বঞ্চনা কাহাকে বলে?

কমিউনেল অ্যাওয়ার্ড কখনও প্রজাতন্ত্রের আদর্শ হয় কি? ইহার বিরোধিতা করা হইল না, কিন্তু ফেডারেশনে দেশীয় রাজগণের প্রতিনিধিরা প্রজার দ্বারা নির্ব্বাচিত নয় বলিয়া উহা বদলাইবার জন্য সংঘর্ষের জোড়তোড় কেন? একজন মেম্বারকে এক সম্প্রদায় নির্ব্বাচিত করিল কিন্তু অন্য সম্প্রদায় নির্ব্বাচিত করিবার অধিকারই পাইল না; কিন্তু সে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিল, এমন মন্ত্রীকে দেশের সর্ব্বসাধারণের মন্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? যদি ইহাও প্রজাতন্ত্র হয় তবে পার্লিয়ামেণ্টের মন্ত্রীরাই আমাদের দেশের মন্ত্রিত্ব করিলে আমাদের ক্ষতি কি ছিল? আমরা কংগ্রেসের ভণ্ডামীর সমালোচনার ভাষা পাই না। মিঃ ফজলুল হক্ যদি বাংলাদেশের হিন্দুদের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইয়াই হিন্দুদের তরফ হইতে মন্ত্রিত্ব করিতে পারেন তবে মিঃ চেম্বারলেনই বা হিন্দুদের তরফ হইতে মন্ত্রিত্ব করিতে কেন পারিবেন না? আমরা ইহাই বলিতে পারি "জাতীয় মুক্তির পথে গান্ধীবাদীরা অত্যন্ত বিপদ্‌জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" আমরা কংগ্রেস, মহাসভা, লীগ ও অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিবাদ গ্রহণ করিতে বলিতেছি। আমরা যে কোন গভর্ণমেণ্টকেই দুর্ব্বল স্তরের শাসন নীতি ও আসুরিক শাসননীতি ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া লোকপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে বলিতেছি। কংগ্রেস যদি শক্তিশালী কর্ম্মবিজ্ঞান গ্রহণ করিত তবে হিন্দু মহাসভার কখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিবার প্রয়োজন হইত না।

৭২। হিন্দু মহাসভা রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবার দরুণ হিন্দুরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে যেভাবে হিন্দুদের ঠকান হইয়াছে উহার প্রতিকারের জন্য শক্তিশালী আন্দোলনের ভিত্তি হিন্দু মহাসভার লওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন সম্প্রদায় ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি ত্যাগ করিয়া কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে চায়, তবে হিন্দুমহাসভার কর্ত্তব্য সংখ্যানুসারে তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোণঠ্যাসা করিয়া রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাওয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ লক্ষ্য হইতে চ্যুত না হওয়া। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যদি এদেশের শাসননীতির মূল সূত্রই হইয়া থাকে তবে উহাতে সম্প্রদায়গুলিকে সংখ্যানুপাতে আসন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহাসভার কর্ত্তব্য দুর্ব্বল চিন্তাপুষ্ট কংগ্রেসের কথায় কান না দিয়া শক্তিশালী ভিত্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসা। ছয় কলার চিন্তায় নিয়মিত কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ শুধু মুস্লিম লীগকে দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই অদূরদর্শী, ভাবপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের আর শক্তি নাই যে ইহা সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত কোন যুগে সংঘর্ষ বাধাইতে পারে। এখন এই প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মিতালী করিয়া চলিতে বাধ্য। ইহাদের মধ্যস্থিত বাম পন্থীগণকে ইহারা জমিদার ও দেশীয় রাজাদের সহিত লড়াইয়া হাতে রাখিতে চায়। ইহাদের মতে ইহাই নাকি সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা চিন্তাশীল কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে শক্তিবাদ বিজ্ঞান বুঝিতে বলিতেছি এবং তাহাদের পুরাতন নীতি ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বিজ্ঞানে সংঘর্ষবিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে বলিতেছি। ইঁহারা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কর্ত্তব্য, কিছুদিন নীরবে থাকিয়া কিছু বুঝিতে চেষ্টা করা। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যত প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে উহাদের মধ্যে হিন্দু সভাই শক্তিবাদ

লইতে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, কারণ ইহারা কোন সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার খর্ব্ব করিতে চায় নাই।

৭৩। কংগ্রেস-পন্থীগণকে আমরা জাতীয়তাবাদী বলিয়া স্বীকার করি না। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকবাদী মুস্লিম লীগের ভয়ে জাতীয়তা বাদের সর্ব্বপ্রকার উপাদান ত্যাগ করিয়াছে। মুস্লিম লীগ এমন কায়দায় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে নাচিতেছে যে জাতীয় শক্তি ও কৃষ্টির কোন প্রকার উপাদান গ্রহণ করিতে কংগ্রেস আর শক্তি রাখে না। ইহারা জাতীয়তাবাদের জন্য পশ্চিমের চিন্তা ও নীতি ভিন্ন জাতীয় কোন প্রকার চিন্তা লইতে চাহিলেই মুস্লিম লীগ একটি দণ্ড দর্শন করাইয়া ইহাদের মাথা নীচু করাইয়া দেয়। বিজাতীয় উপাদানে শুধু হিন্দুর চিন্তাকে বিজাতীয় করণকেই বর্ত্তমান কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের ভিত্তি করিয়াছে। যে জাতির মধ্যে শক্তিবাদের মত শক্তিশালী চিন্তা রহিয়াছে সে জাতি উহা গ্রহণ করিবে কি না ইহা হিন্দু মহাসভা মাথা তুলিলেই প্রমাণিত হইয়া যাইবে। বৃথা কতকগুলি আদর্শের পিছনে দৌড়াইতে যাইয়া কংগ্রেস অশান্তি বৃদ্ধি এবং জাতীয় শক্তি ক্ষীণ করিতেছে। কংগ্রেস এখন সংঘর্ষের কথা আওড়াইয়া যুবকগণকে নানা প্রকারে ভাঁওতা দিতেছে। কংগ্রেস যদি মনে করে এইরূপ ভাঁওতার মধ্য দিয়া জাতীয় মুক্তির পথ করিবে তবে তাহারা অত্যন্ত ভুল করিবে। সব সময় সংঘর্ষ দ্বারাও শক্তিবৃদ্ধি হয় না। সংঘর্ষের সময় আছে এবং উহার বিজ্ঞানও আছে। আমরা দেশবাসীকে ইহাই বলিতে পারি যে ভাঁওতা-বিজ্ঞান এবং শক্তি-বিজ্ঞান এক নহে। কেন্দ্রীয় শক্তির সহিত লড়াই দেওয়া সব সময় শক্তি-সঞ্চয়ের অনুকূল হয় না।

ভারত বৃটেন সম্বন্ধ ও শক্তিবাদ

৭৪। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ অনেক দিনের। বৃটেনের রাজা ভারতের সম্রাট। সম্রাটের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুবই কম। বৃটেনের মন্ত্রিসভাই আমাদের সহিত সম্রাটের সম্বন্ধযুক্ত সকল কাজ করেন। এই মন্ত্রিসভা সম্রাট অপেক্ষা বৃটেনের জনসাধারণের নিকট বেশী দায়ী। এক কথায় সম্রাট আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধই রাখেন না। এদেশে তাঁহার প্রতিনিধি বড়লাট। তিনি সম্রাট ও মন্ত্রিসভার নির্দ্দিষ্ট আইন রক্ষার ভার লইয়া এদেশে আসেন এবং উহা করিয়া চলিয়া যান। প্রায় দুই শত বর্ষ আমরা বৃটেনের শাসনাধীন থাকিয়া স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, অন্নে, বস্ত্রে, গৃহে, শিল্পে, বাণিজ্যে অত্যন্ত হীন দশাগ্রস্ত হইয়া গিয়াছি। সম্রাটের কর্ত্তব্য প্রজার এই সব দুঃখের মূল ছিন্ন করিয়া প্রজাগণকে সুখী করা। ভারতশাসন আইন অনুসারে ভারতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, কাজেই মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্য প্রস্তাব দ্বারা ভারতের এই দুর্দ্দশার প্রতিকার করা এবং বড়লাট সম্মত না হইলে উহা সম্রাটকে জানাইবার পথ বাহির করা। বৃটেনের জনসাধারণের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভা ভারতকে ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত করাইয়াছে। ভারত এই মন্ত্রিসভার সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চায়।

৭৫। বৃটেনের মন্ত্রিসভা বৃটেনবাসীর প্রতিনিধি হইবার দরুণ এই মন্ত্রিসভা ভারতশাসন ব্যাপারে যে নীতি চালায় তাহাতে ভারতের সর্ব্ববিধ সুখ সম্পদ বৃটেনের ধনী, গরীব, বেণে, মজুর, জমিদার, মহাজন, ঔষধওয়ালা, কারখানাওয়ালা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত হয়, এবং ভারতের ধনীগরীব শোষিত হয়। ঐ দেশের জমিদারের ছেলেরাই সাধারণতঃ এদেশে বড় বড় অফিসের মোটা মাহিয়ানার বড় কর্ম্মচারীরূপে আসেন। আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের যত আয় উহার একটা বৃহৎ অংশ অর্থ ঐ দেশের গোরাসৈন্যদিগকে এদেশে পোষণ করিতে বাহির হইয়া যায়। এ দেশের সর্ব্ববিধ শিল্প ঐ দেশের মিলওয়ালাদের স্বার্থের জন্য ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেশের ঔষধওয়ালাগণকে ধনী করিবার জন্য এই দেশের দেশীয় চিকিৎসাকে আইন অনুসারে সরকার দ্বারা অসমর্থিত চিকিৎসার স্তরে রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশের বেকারদের কাজের সংস্থান নাই, কিন্তু ঐ দেশের সৈন্য, সিভিলিয়ান প্রভৃতিকে আমাদিগকে পোষণ করিতে হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার ঘাটীগুলি বিদেশীদের দখলে। দেশের দারিদ্র ও বেকারীর জন্য দায়ী ঐ দেশের মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসননীতি। এ সব অনীতির প্রতিবাদ করিলেও আইনতঃ দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য এরূপ বহুমুখী শোষণ কোন বিকাশবাদী রাজশক্তির নীতি হইতে পারে না। ব্রিটিশ-ভারত সম্বন্ধের যে কোন অংশ আলোচনা করা যায় সবই নিরাশাপূর্ণ ও বিরক্তিকর। ইহার প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সহিত সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন না হইলে ভারতের এই ব্যাপক দারিদ্র ও বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব। যে নীতিতে ভারত শাসিত হয় উহা কোন বিকাশনীতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহা নিছক আসুরিক নীতি। ইহার সত্বর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

কমিউনেল অ্যাওয়ার্ড ও শক্তিবাদ

৭৬। কমিউনেল অ্যাওয়ার্ড কি উহা প্রত্যেক শক্তিবাদীরই জানা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শাসননীতি বোঝা এবং উহাকে শক্তিস্তরের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করার সহিতই শক্তিবাদীর কর্ম্মলক্ষ্যের মূল সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই 'গভার্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' না পড়িলে শক্তিবাদীর কাজের সুবিধা হইবে না। এই কনষ্টিটিউসনকে গ্রহণ করিয়া ইহাতে কোন স্থানে কি ভাবে আঘাত করিয়া ইহাকে কার্য্যের উপযোগী করা যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল। বলা প্রয়োজন ইহা কংগ্রেসেরই কর্ত্তব্য ছিল। কংগ্রেস উহা করে নাই। কংগ্রেস উহার শক্তি সম্বন্ধে কোন আভাসই দেশকে দেয় নাই বরং সর্ব্বদা উহার বিপরীত আচরণ করিয়াছে। কংগ্রেস বলিয়াছে এক এবং করিয়াছে অন্যরূপ। কংগ্রেস দুর্ব্বলস্তরের চিন্তাবিজ্ঞান গ্রহণ করিবার দরুণ এইরূপ ভুল হওয়া স্বাভাবিক। গান্ধীবাদের দুর্ব্বলতা এই যে উহা শক্তিবিজ্ঞান বুঝিতে বাধা দেয় এবং কতকগুলি বাঁধা বুলির চক্করে মানুষকে খাবি খাওয়ায়। কনষ্টিটিউসন যতই দুর্ব্বল হউক না কেন উহা ত্যাগ করা অপেক্ষা শক্তিহীন গান্ধীবাদের জন্য উহা গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। ইহা প্রত্যেক শক্তিবাদী মনে রাখিবেন। গান্ধীবাদী-কংগ্রেস দুর্ব্বল কর্ম্মবিজ্ঞান

গ্রহণ করিবার দরুণ উহা বিগত বিশ বৎসর কেবল ভুলই করিয়া আসিতেছে। সুতরাং শক্তিবাদের উত্থান এখন অপরিহার্য্য।

৭৭। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট দুইভাবে বিভক্ত। ইহার একদিকে প্রভিন্সিয়াল অটোনমী, অন্যদিকে ফেডারেশন। ফেডারেশনের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধ আছে। প্রভিন্সিয়েল অটোনমীতে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার যতটা শক্তি আছে উহা হইতে দেশীয় রাজারা অনেক শক্তিশালী। এই দেশীয় সামন্তগণ যদি শক্তিবিজ্ঞান বুঝিতে পারেন তবে তাঁহারা নিজেদের প্রজাশক্তিকে নিজেদের শক্তির প্রাচুর্য্যকরণ কার্য্যে লাগাইতে পারেন। দেশীয় প্রজারা বৃটিশ ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছে। তাহাদের কর্ত্তব্য শক্তিবাদ বোঝা এবং নিজ নিজ রাজাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করা। কেহ কেহ দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার অধীন করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। ইহা দেশীয় প্রজাগণের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলকর ব্যাপার হইবে। যদি দেশীয় রাজ্যের প্রজারা এইরূপ আন্দোলনে সহানুভূতি দেখায় তবে ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হইবে। আমরা ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি বহু দেশীয় রাজ্যের প্রজারা বৃটিশ ভারতীয় প্রজা হইতে বহু বিষয়ে সুখে আছে। সেখানকার প্রজারা যদি চেষ্টা করে তবে সেখানকার শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা হইতে উন্নত ও সুখের অনুকূল হইবে। কংগ্রেস চায় ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় রাজ্যের ভোট পাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে। এজন্য সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া তাহারা সেখানে প্রজাতন্ত্র স্থাপনার দ্বারা নিজেদের স্বার্থ পূর্ণ করিতে চায়। দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের জন্য দরদ দেখাইবার কারণ এইখানেই বিদ্যমান। দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণকে আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এবং লিগী মন্ত্রিসভার কার্য্যাবলী বিচার করিয়া সাবধান হইতে বলিতেছি। গান্ধীবাদ একটা প্রদেশকে শাসন করিবার জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কর্ম্মবিজ্ঞান ইহা যেন তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন। আবার মুশলিম প্রাধান্য যুক্ত বাংলার মন্ত্রিসভার কুকীর্ত্তি 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আইন' প্রভৃতি সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর আইন করিয়া গুণ্ডামী প্রতিষ্ঠার সমকক্ষ বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। পাঁচ বছরের জন্য নির্ব্বাচিত কোন মন্ত্রীই একজন রাজার সমকক্ষ হইতে পারেন না। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি ভারতের পক্ষে এখন একজন আসুরিক রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা খুবই কঠিন। রাজারা যাহাতে দুর্ব্বল চিন্তা গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বল না হয় এবং দাম্ভিক হইয়া আসুরিক না হয় এজন্য প্রজার হাতে মন্ত্রিসভার কাজ যথেষ্ট ছাড়িয়া দেওয়ার নীতি প্রত্যেক রাজাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সামন্ত প্রজাসাধারণকে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে গান্ধীবাদীরা ভারতশাসন আইনের একটা অক্ষর পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; তাহারা রাজাদের কিছুই করিবার শক্তি রাখে না। সামন্তরাজ্যে রাজতন্ত্র উল্টাইয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপনার দ্বারা প্রজার ভোটে ফেডারেশনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে, ইহাও বৃটিশ রাজত্বে অসম্ভব। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণকে উস্কাইয়া ফেডারেসনের ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইবার পথ করিতেছে। হিন্দুর ভোটের জোরে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গ্রহণ করিয়া

কংগ্রেস হিন্দুগণের উপরেই অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এদিকে রাজাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানী দিতে যাইয়া তাঁহাদেরও সহানুভূতি হারাইয়াছে, কাজেই ভবিষ্যতে যে কংগ্রেস ফেডারেসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারিবে এইরূপ আশা করা যায় না।

৭৮। ভারতশাসন আইনের উভয় ভাগেই কংগ্রেসকে ঠকাইবার জন্য হিন্দুগণকে ঠকানো হইয়াছে। হিন্দুরাও গান্ধীবাদী কংগ্রেসের ভাঁওতায় পড়িয়া নিজেদের অধিকারসঙ্কোচ মানিয়াই লইয়াছে। হিন্দুদের এই অধিকার-খর্ব্বতা প্রতিকারের চেষ্টা যাহাতে রুদ্ধ হয় এজন্য কংগ্রেস প্রথমেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সপক্ষে ওকালতি করিবার জন্য "সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবীরক্ষার দায়িত্ব" গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুরা গান্ধীবাদরূপ জাতীয়তাবাদের ভাঁওতায় কিরূপ খাবি খাইয়াছে উহা ঐ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা কংগ্রেসকে ক্ষমা করিতে পারি, কারণ উহা ছিল শক্তিহীন একদল ভাববাদীর আড্ডা; কিন্তু মহাসভাকে ক্ষমা করিতে পারি না, কারণ উহা দ্বারা ভারতের বৃহত্তম সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এবং এই কারণেই ভারতের জাতীয়তাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু হিন্দুর সংখ্যানুসারে হিন্দুগণকে না ঠকাইলেই ভারতের জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী থাকে। কংগ্রেস যদি এই দিকে নজর দেয় তবে তাহার গান্ধীবাদও বিপদগ্রস্ত হয়। সে সব ছাড়িতে পারে কিন্তু গান্ধিবাদ ত্যাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই তাহারা এসব ব্যবস্থাপক সভার আসনের জন্য লড়াই না করিয়া কৃষক ও মজুরদের পিছনে লাগিয়াছে। তাহাতেও দেখা গেল মুস্লীম লীগের সামনে আঁটা দায়। ইহাতেও তাঁহারা নিরাশ হন নাই। কারণ ইহা দ্বারা জাতীয়তাবাদের প্রধান সমর্থক হিন্দুগণকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দিবার আলো তাঁহারা নাকি পাইয়াছেন! ইতিমধ্যে গান্ধী বাবা ও তাঁহার চেলারা বহুবার মুস্লিম লীগের গুরুদেব মিঃ জিন্নার পদে তৈল মর্দ্দন করিয়া আসিয়াছেন, তবে গুরুদেব নাকি প্রসন্ন হন নাই। তিনি যে প্রসন্ন হইবেন না ইহা কিন্তু শক্তিবাদীরা জানে। যাহা হউক দক্ষিণ ও বামপন্থী কংগ্রেসীগণ সময়ে অনেক কিছু বুঝিবেন। শক্তিবাদীরা এখন ঐ দুইটা দিক বাদ দিয়াই চলিবেন। শক্তিবাদীরা জানিবেন ভারতমুক্তির জন্য সংখ্যানুসারে প্রদত্ত ঐ হিন্দু সীটগুলিকে বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হয় বাঁটোয়ারা সমন্বিত কনষ্টিটিউসন বদলাইয়া লইতে হইবে অথবা সংখ্যানুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আসন দিবার নীতিসহ ইহাকে সংশোধন করিতে হইবে। যাঁহারা ভারতের মুক্তি চান তাঁহাদের জন্য ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বস্তু। কারণ আদর্শবাদের ছড়া শুনাইয়া জাতীয়তাবিরুদ্ধবাদীগণকে জাতীয়তাবাদী করা যাইবে না। আবার কংগ্রসকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে হিন্দুর উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হিন্দুদের ভোটও আর বেশীদিন পাইতে হইবে না। কেন্দ্রীয় শাসননীতির অন্যায় ও অনীতির বিরুদ্ধে লড়াই দিবার বিজ্ঞান দ্বারাই একটা জাতিকে শক্তিশালী করা যায়। যে দেশের জাতীয়তাবাদকে দুর্ব্বল করিবার জন্য এত বড় একটা অনীতি সেই দেশের কনষ্টিটিউসানে রাখা আছে সেই জাতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য ইহা একটা অলৌকিক বরদান জানিতে হইবে। মহাসভার কর্ম্মীরা এইদিকে নজর ফিরাইয়া দিয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করুন এবং গান্ধীবাদকে ভারতের বুক হইতে বিসর্জ্জন দিয়া শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ স্থাপন করিতে সাহায্য

করুন। মহাসভা শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করিলে কংগ্রেস নিজের নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে, অথবা ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকিবে না। মহাসভা কতটা কিরূপ অগ্রসর হইবে উহা আমরা জানি না। সুতরাং শক্তিবাদীরা কাহারও উপর অকারণ বিশ্বাস স্থাপন করার নীতি ত্যাগ করিয়া নিজেদের স্বাধীন মতবাদ লইয়া অগ্রসর হইবেন। ভারত শাসন আইনে যে অধিকারটুকু দেওয়া হইয়াছে উহাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কতকটা অধিকার দেশবাসীর হাতে আসিয়া গিয়াছে। এই কনষ্টিটিউসনকে ফেডারেসনের এক ধাপ বলা যায়। গান্ধীবাদীরা এমন সব অদূরদর্শী রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন যে ভারতকে ইণ্ডিয়া অ্যাক্টএ দেয় ফেডারেসনের অংশ আদায় করিতেও যথেষ্ট সময় লাগিবে। কংগ্রস যদি শক্তিবাদ না লয় তবে এই লোকপ্রিয় প্রতিষ্ঠান আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে লোকচক্ষে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হইবে এবং পূর্ণ ফেডারেসন আদায় করিতে বহু সময় নষ্ট করিবে।

৭৯। এদেশে এসময় নিয়মতান্ত্রিকবাদী ও পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী এই দুইটা লক্ষ্য সম্পন্ন মতবাদ আছে। নিয়মতান্ত্রিকতার লক্ষ্য ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসে সম্রাটের অধীনে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, বৈদেশিক ব্যাপারের ব্যবস্থা ও সৈন্য বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব সবই থাকে। সম্রাটের অধীনতা মানা ভিন্ন "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের" সহিত "পূর্ণ স্বাধীনতার" বিশেষ কোনই ভেদ নাই। কাজেই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও পূর্ণ স্বাধীনতা শক্তিবাদের দৃষ্টিতে একই বস্তু। শক্তিবাদ রাজতন্ত্র মানে কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্ব্বল নীতি এবং আস্থরিক নীতি মানে না।

৮০। যাঁহাদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহারা এই মুহূর্ত্তে অহিংসাবাদ ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা একদিনও এই অহিংসাবাদের স্বপক্ষে ওকালতি করিলে এই ওকালতি তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার শত্রু রূপেই পুষ্টি লাভ করিতে থাকিবে। শুধু কৃষক ও মজুর বিপ্লবের দ্বারা কিছু হইবে না। কারণ এভাবে আন্দোলন বা লড়াই বাধাইলে ইহা হইতে আরো অধিক একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ বিপরীতপক্ষে যোগদান করিবে। সুতরাং পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীগণকে সমাজতান্ত্রিকতার এই আদর্শবাদ ত্যাগ করিতে হইবে। একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ যে কোন বিপ্লবী শক্তির পিছনে থাকা চাই। এইরূপ সমাজ বর্ত্তমান ভারতে কেবল হিন্দুরাই হইতে পারে। কাজেই গান্ধীবাদীদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিয়া যাহারা হিন্দুদের শক্তি ও স্বার্থ নষ্ট করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে ইহাদিগকে উহা ত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দুদের স্বার্থ বিক্রয় করিয়া মুসলমানদের মনোরঞ্জননীতিতে মুসলমানদের সমর্থন জাতীয়তার অনুকূলে পাওয়া যাইবে না। হিন্দুগণকে বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে শুধু পূর্ণ স্বরাজলাভের ভাঁওতা দ্বারা স্বপক্ষেও রাখা যাইবে না। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন সকলের চক্ষু খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতার মতবাদীরা সকলে হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য কোন দেশ বা সমাজের ছেলে উহা আমরা জানিতে চাহিনা, কিন্তু ইহাদের পিছনে গোটা হিন্দু সমাজের সমর্থন থাকা চাই একথা যেন ইঁহারা মনে রাখেন। এ পথের পথিকরা হিন্দু সমাজের প্রতিকূল হইলে চলিবে না। এই পথে যাঁহারা চলিবেন তাঁহাদের

পিছনে ব্যবস্থাপক সভার সমর্থন অত্যন্ত অপরিহার্য্য বস্তু। গান্ধীবাদীরা ব্যবস্থাপক সভার কর্ণধার থাকিলে উহা অসম্ভব সুতরাং ইঁহাদিগকে দেশের চিন্তা হইতে গান্ধিবাদের প্রভাব ভাঙ্গিবার কাজে হাত দিতে হইবে। যে শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব করা যায় সেই শক্তির সহিত শত্রুতায় নিযুক্ত কোন শক্তির অস্ত্রবল পেছনে থাকিলে ভাল হয়। সৈন্য বিভাগ বিপ্লবী না হইলে বিপ্লব সফল হয় না। কাজেই এসব দিকে চিন্তা ও কর্ম্ম লক্ষ্য নিয়োগ না করিয়া ইঁহারা যদি নিয়মতান্ত্রিকগণকে অকারণে দোষ দিতে থাকেন তবে উহা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এইরূপ সমস্ত প্রকার শক্তিলাভের সুযোগ পাইলেও বৃটিশের বিপদের দিন না আসা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাদের কর্ম্মধারার আরও একটা দিক আছে। উহা হইল বিপ্লবের দিনে সমাজের উপর গুণ্ডার উপদ্রব দমন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা। আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমাজের উপর গুণ্ডাদের যে কিরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে উহাদের বিরুদ্ধে এই পন্থীদের কর্ম্মধারার বিশেষ সংযোগ থাকা প্রয়োজন। ইহাদিগকে টেরোরিজম্ ত্যাগ করিতে হইবে এবং প্রকাশ্যে নিজেদের কর্ম্মধারার কথা আলোচনা করিয়া তাহাদের কর্ম্মবিজ্ঞানই যে বেশী শক্তিশালী ইহা প্রমাণ করিয়া চলিতে হইবে। এ পথ বর্ত্তমান সময় সম্ভব কি অসম্ভব ইহা পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীগণ বিচার করিয়া স্থির করিবেন।

৮১। অহিংস বিদ্রোহ কখনও পূর্ণ স্বাধীনতার বিদ্রোহ হইতে পারে না। ইহা খাঁটি নিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহ। অতীতে এই নিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহকে পূর্ণ স্বাধীনতার বিদ্রোহ বলিয়া চালাইবার দরুণই ভারতের স্বাধীনতার প্রধান অবলম্বন হিন্দুরা ভারতশাসনআইনে নানা প্রকারে শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ সরকার বহু বৎসর এই অহিংস বিদ্রোহের শক্তি পরীক্ষা করিয়া কমিউনেল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করিয়া এই আন্দোলনের অগ্রগতি চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থ বিক্রয় করিয়াও মুস্লিম লীগের গতি কংগ্রেসমুখী করিবার চেষ্টা সফল করিতে পারে নাই। যদি পারিত তবে ভারতশাসন আইন গান্ধীবাদ দ্বারা নূতন রূপ ধারণ করিত। কি নিয়মতান্ত্রিক, কি বিদ্রোহ কোন পথে আর গান্ধীবাদী কংগ্রেসের জন্য পথ খোলা নাই। তবুও এপথে যাঁহারা সময় নষ্ট করিতে চাহেন তাঁহাদের কার্য্যে শক্তিবাদীরা সহায়ক হইবেন না। তাঁহারা একদিন নিরস্ত হইবেন কিন্তু অনেক ক্ষতি করিবার পর।

৮২। নিয়মতান্ত্রিক পথে কি করিয়া চলিতে হইবে উহার আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে।

(ক) এই পথে যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা গান্ধীবাদ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ গ্রহণ করিবেন। যেহেতু সময়ে প্রয়োগ করিলে সত্যাগ্রহের দ্বারাও কিছু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অতএব শক্তিবাদীর পক্ষে তাঁহাদের বহু অস্ত্রের মধ্যে ইহাও একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র হইবে।

(খ) হিন্দু সমাজের পূর্ণ সমর্থন অটুট ভাবে পাইবার জন্য হিন্দু স্বার্থরক্ষা ও ভারতীয় কৃষ্টি রক্ষার নীতি মানিয়া লইতে হইবে। এবং ব্যবস্থাপক সভাতে ইহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার আসন উদ্ধার করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার রক্ষাও শক্তিবাদীর কর্ম্ম নীতির অপরিহার্য্য অংশ।

(গ) শ্রেণীসংঘর্ষবাদ ত্যাগ করিয়া গরীবদের অবস্থার উন্নতি ও বেকারদের কর্ম্ম সংস্থানের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) দেশীয় নৃপতিদের ভোটের সমর্থন যাহাতে জাতীয়তার অনুকূলে হয় এজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন ত্যাগ করিতে হইবে। এবং তাঁহাদের রাজ্যে যাহাতে শাসন নীতি উন্নত হয় এজন্য রাজা ও প্রজার মধ্যে শক্তিবাদ প্রচার করিয়া রাজা ও প্রজা মিশ্র শক্তিবাদী শাসন নীতি স্থাপনায় সাহায্য করিতে হইবে।

(ঙ) সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলিকে বিনা সর্ত্তে শক্তিবাদের অনুকূলে আসিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। যাহারা আসিতে চাহিবে না তাহাদের সংখ্যানুসারে ন্যায্য প্রাপ্য দিবার নীতি মানিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং কোন সম্প্রদায় সংখ্যানুসারে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বেশীর জন্য লড়াই বাধাইলে উহাকে আসুরিক নীতি মানিতে হইবে।

(চ) সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে এবং সম্রাটের অধীনে ভারতীয় মন্ত্রিসভা বৃটিশ পার্লামেণ্টের সমকক্ষ অবস্থায় আনিবার লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ছ) বৃটেন ভারতের উক্ত প্রকার লক্ষ্যে যত দিন সহমত হইবে না ততদিন নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা চালাইয়া চলিতে হইবে।

(জ) নিয়ম তান্ত্রিকগণ হিন্দুস্থানি ভাষা চালাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিবেন। ফেডারেল অ্যাসেম্ব্লিতে ইংরাজীভাষা আইনে প্রতিষ্ঠিত ভাষা। উহা এখন চালাইতেই হইবে। হিন্দুস্থানী ভাষা পড়িয়া না উর্দ্দূ ভাষার সাহিত্য বুঝা যায়, না কোন প্রাদেশিক ভাষা আলোচনা করা যায়। ইহা বলিলে হিন্দীভাষীরাও বোঝে না উর্দ্দূভাষাভাষীরাও বোঝে না। ইহা দ্বারা দেশের লোককে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতহীন অদ্ভুত রকমে শিক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা কোন কাজেই আসিবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতে ইংরাজী চালাইবার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে কোন শক্তিশালী প্রাদেশিক ভাষা চালাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে।

৮৩। শক্তিবাদের আশ্রয়ে নিয়মতান্ত্রিক ও পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ দুইই গ্রহণ করা যায়। শক্তিবাদের আশ্রয়ে নিয়মতান্ত্রিকতা এত বড় শক্তিশালী অস্ত্র যে উহা বুঝিতে পারিলে দেশের মধ্যে একটা নূতন সাড়া ও শক্তি আসিবে।

ভারতশাসন আইনে কতকগুলি সংরক্ষিত বিভাগ আছে। নিয়মতান্ত্রিকগণ ঐ দিকে নিজেদের লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিবেন। সংরক্ষিত অংশে সৈন্য বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, বৃটেনের বাণিজ্য স্বার্থ ও রেলওয়ে ইত্যাদি আছে। সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করণ সম্বন্ধে প্রস্তাব আনা, পররাষ্ট্র বিভাগে ভারতের স্বার্থবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে বাধা দিবার জন্য প্রস্তাব করা, বৃটেনের বাণিজ্য স্বার্থের বিনিময়ে ভারতের বাণিজ্য স্বার্থ উন্নত করিবার চেষ্টা করা, রেলওয়ের মাল ভারত হইতে লইবার চেষ্টা করা, রেলগাড়ীতে অতিরিক্ত যাত্রী লওয়ার নিয়ম একেবারে রহিত করিবার চেষ্টা করা ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব পাস করাইয়া উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাধ্য করাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট যেখানে নিজের ক্ষমতাবলে জনমত অগ্রাহ্য করিবেন সেখানেই নিয়ম তান্ত্রিক বিদ্রোহ আনিতে হইবে। নিয়ম তান্ত্রিকগণ একদিনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আনিয়া গোলমাল বাধাইবেন না। ইহাতে শক্তিহীন হইবার সম্ভাবনা থাকে। এদিকে মুস্লিম লীগের দিক হইতে ভারতকে নানা প্রকার জোনে (Zone) ভাগ করিয়া নিত্য নূতন ভারতশাসনের পরিকল্পনার কার্য্য চলিতেছে। এই পরিকল্পনাগুলির একটা মজার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে সংরক্ষিত বিষয়গুলির উপর আধিপত্য বৃদ্ধির কোনই কথা থাকে না। কিন্তু হস্তান্তরিত বিষয়গুলিকে কিভাবে সাম্প্রদায়িক মুস্লিম স্বার্থে লাগানো যায় সেই দিকটায় চেষ্টা বেশ থাকে। এসব পরিকল্পনা যেন কেহ হাস্যাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া না দেন। ইহার উদ্দেশ্য আছে, কোন সময় এসব পরিকল্পনার ছায়া কাজে আসিতে পারে। কাজেই নিয়মতান্ত্রিকবাদীরা এ সবের দোষ দেখাইয়া ইহার প্রতিবাদ করিবেন। ভারত-শাসন-বিধি নিয়ম-তান্ত্রিকগণ নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যে সব পক্ষপাতমূলক অংশ আছে উহার সংশোধন পরে আরম্ভ করিবেন। ইহাকে উল্টানো পাল্টানোর স্কীমকে সর্ব্বথা সমালোচনাসহ বর্জ্জন করিবেন। অহিংসাবাদীরা কখনও নিয়মতান্ত্রিকতার বাহিরে যাইতে পারেন না। ইঁহারা দক্ষিণ বা বামপন্থী যাহাই হউন না কেন অহিংসাবাদীরা নিয়মতান্ত্রিক এ কথা একবাক্যে মানিয়া লইতে হইবে। অহিংসাবাদী হইয়া যাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন তাঁহারা হয় নিজের কর্ম্মবিজ্ঞানের শক্তি জানেন না অথবা তাঁহারা মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ। এইরূপ নেতাদের প্রশংসা করা বা ইঁহাদের অনুসরণ করা দুইই শক্তিবাদীরা ত্যাগ করিবেন। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে এইরূপ নেতাদের চরিত্রের কোন অংশই প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না। যাঁহাদের কর্ম্মনীতিতে হিংসা বা অহিংসার কোন ভণ্ডামী নাই, অর্থাৎ যাঁহারা শক্তিবাদী তাঁহারা নিয়ম তান্ত্রিক এবং পূর্ণ স্বরাজবাদী দুইই হইতে পারেন।

৮৪। কংগ্রেসের অদূরদর্শী লড়াইয়ের সুযোগ লইয়া মুস্লিম লীগ ভারত শাসন আইনে একটা শক্তিশালী অংশ আদায় করিয়াছে। ইহা এখন নিছক জাতীয়তাবিরোধী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতশাসন আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠগণের স্বার্থরক্ষা করিবার ভার গভার্ণরদের হাতে সংরক্ষিত রাখিবার পরও এসেম্ব্রিতে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলিকে

সংখ্যাতিরিক্ত আসন দিবার ব্যবস্থার সার্থকতাই থাকে না। ইহা উন্নততর সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুগণকে ঠকাইবার হীন চাল মাত্র। হিন্দুগণের জন্য ইহা অত্যন্ত অপমানকর বিধান। মুস্লিম লীগ সুযোগ খুঁজিতেছে কি করিয়া গান্ধীবাদী কংগ্রেসকে আবার বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ানো যায় এবং সেই সুযোগে কি করিয়া ভারতের জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল করিয়া সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। কংগ্রেস যে বিজ্ঞানে লড়াইয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য ভাবিতেছে এবং যে বিজ্ঞানে লড়াই বাধাইয়া অতীতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে উহার প্রতিফলে ইহাই দাঁড়াইবে যে একদল জাতীয়তাবাদী মহাসভার আশ্রয় লইয়া উহা আদায় করিবার জন্য আরও একটা লড়াই দিতে বাধ্য হইবে। কংগ্রেস অকারণ জাতীয়তাবাদের সামনে কতকগুলি সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে। কংগ্রেসের কর্ত্তব্য এই নারীজনোচিত গান্ধীবাদ বিজ্ঞানের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য শক্তিবাদ আলোচনা করা এবং এইরূপ অভিমানের লড়াই ত্যাগ করা।

৮৫। সংক্ষেপে আমরা কমিউনেল অ্যাওয়ার্ড আলোচনা করিলাম। পাঠকগণের প্রতি ইহা আমাদের শেষ কথা - তুমি নিয়মতান্ত্রিক হও বা পূর্ণ স্বরাজবাদী হও, যদি তুমি তোমার দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করিতে চাও তবে তুমি শক্তিবাদবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া উহা করিও, অথবা একটা বিরাট জাতির ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইতে দূরে থাকিও। ইহা পাব্লিক অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসনের যুগ। এ যুগে তুমি বৃক্ষতলবাসী ভিখারী হও বা বনবাসী যোগী হও অথবা অর্থহীন কাঙাল হও বা বিত্তশালী মহাজন হও, এ যুগে জমীদার বা রাজাগণকে ইতিপূর্ব্ব যুগের মত নিশ্চিন্তে জমীদারী বা রাজ্যভোগ করিতে দেওয়া চলিবে না। সকলকেই নামিতে হইবে, ভাবিতে হইবে এবং কর্ম্ম করিতে হইবে। সকলকেই পাব্লিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেসনে ভাগ লইতে হইবে। এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে তুমি কিছুই করিতে পার বা নাও পার তোমাকে শক্তিবিজ্ঞান বুঝিতেই হইবে। সামান্য সুবিধা সুযোগ লইবার জন্য যাহারা ভারতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মলিন বেশ পরিধান করিয়া বিদেশীর কৃপাকাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়াছ, তাহারা ঐ মলিন বেশ ত্যাগ কর এবং শক্তিবাদের আশ্রয়ে জাতীয়তার অংশ গ্রহণ করিয়া গৌরব অর্জ্জন কর। যদি উহা না কর তবে তোমরা শক্তিহীন সংখ্যালঘিষ্ঠ স্থান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। তোমাদের দৈন্যে শক্তিবাদের দীনতা হইবে না। তুমি নিয়মতান্ত্রিক বা পূর্ণ স্বরাজবাদী যাই হও না, তোমার জন্য নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামো গ্রহণ অপরিহার্য্য। ইহা যদি তুমি শক্তিবিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পার তবে ইহা তোমার লক্ষ্যে কাজে আসিবে অথবা ইহা তোমার ঘোর শত্রুর কাজ করিবে।

সংক্ষেপে শক্তিবাদের কর্ম্মলক্ষ্য ও কর্ম্মের বিভিন্ন দিক

৮৬। নিজের মাতৃভূমিকে পূর্ণ স্বাধীন করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যেরূপ শক্তি আয়ত্ত করা প্রয়োজন শক্তিশালী চিন্তার স্তরে দাঁড়াইয়া উহা আয়ত্ত করিবে। এই লক্ষ্যপথ সহজ করিবার জন্য ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌কে এখনকার মত লক্ষ্য ধরিবে এবং

যথাশক্তি বৃটেনের অনুকূল থাকিয়া প্রস্তুত হইয়া চলিবে। শক্তিবাদ ভারতের গৌরবের যুগে রাজর্ষিগণের চিন্তায় স্থান পাইয়াছিল; কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তিতে এই চিন্তা সমষ্টিসমাজে স্থান দিবার চেষ্টা না হইবার দরুণ এই শক্তিশালী চিন্তার প্রতিষ্ঠা সমাজে স্থায়ি হয় নাই। সমষ্টিসমাজে এই শক্তিশালী চিন্তার প্রতিষ্ঠা থাকিলে, পৌরোহিত্যবাদ ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা জমাইতেই পারিত না। ইহার ফলে এই পৃথিবীর উপর ও ভারতের উপর বহু অত্যাচার ও অনাচারের তাণ্ডব লীলা হইয়া চলিয়াছে। ভারতের বুকে বহু প্রকারের উন্নত বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাবলীরও আবিষ্কার হইয়াছিল, কিন্তু সমষ্টি জীবনে উহার স্থান না হইবার দরুণ উহার সবগুলিই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এসব ভাবিয়া শক্তিবাদীরা সাবধান হইবে এবং শক্তিবাদকে সমষ্টিজীবনে স্থান দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইবে।

৮৭। পৌরোহিত্যবাদের প্রভাবে ভারত তাহার আর্য্য চিন্তার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। উহার ফলে লুণ্ঠন ও লুটতরাজের আদর্শ লইয়া ভারতের পশ্চিম দেশস্থিত মুসলমানগণ ভারতকে আক্রমণ করিলে ভারতের পতন হয়। বহুশত বৎসর ধরিয়া ভারতের উপর লুণ্ঠন ও গুণ্ডামীবাদের রাজত্ব চলে। শেষকালে ভারত এই অনাচার হইতে মুক্তি পাইবার আশায় পশ্চিমের শোষণবাদকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পথ করিয়া দেয়। বর্ত্তমান সময় ভারত এই দুইটা অনীতির সম্মুখীন হইয়াছে। এই দুইটা অনীতি এখন পরস্পরকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে। একমাত্র শক্তিবাদী ভারত এই লুণ্ঠন ও শোষণ সভ্যতার মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম। এই পথে গান্ধিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রধান বাধার কারণ হইলেও ভাবনার কারণ নাই, লুণ্ঠনবাদীরাই সমাজকে চক্ষু ফুটাইতে সাহায্য করিবে।

৮৮। দুর্ব্বল (৫ এবং ৬ কলার) কর্ম্মবিজ্ঞান অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত ত্যাগ করিবে। আসুরিক কর্ম্ম-বিজ্ঞান ও অপুষ্ট কলার কর্ম্ম-বিজ্ঞান হইতে আত্মরক্ষার শক্তিশালী উপায় অবলম্বন করিবে। আসুরিক কর্ম্মবিজ্ঞান ও দুর্ব্বল কর্ম্মবিজ্ঞানকে একই পদার্থ জানিবে।

৮৯। একটা দেশের অধীনে যথেষ্ট সাম্রাজ্য না থাকিলে কোন দেশেই ধনিকের শাসন (শোষণবাদ) বেশী দিন চলিতে পারে না, আবার লুণ্ঠন ও গুণ্ডামী করিয়াও একটা শাসনতন্ত্র স্থায়ী হইতে পারে না। শক্তিবাদের শাসন-নীতি এই দুইয়ের ঘোর বিরোধী। ইহা জানা সত্ত্বেও একদল হতভাগ্য যুবক এ দেশে পাওয়া যাইবে যাহারা শক্তিবাদকে ধনিক শাসনের বাহক বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে। কর্ম্মনীতির এই স্বাভাবিক পরিণতির বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞদিগকে সমাজ যাহাতে শীঘ্র চিনিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া নীরবে থাকিবে।

৯০। পৌরোহিত্যবাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সমস্ত আর্য চিন্তা ও ভারতীয় মহাপুরুষগণকে নিজের করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে। ভারত হইতে গুণ্ডামীবাদকে উচ্ছেদ

করিবার জন্য সমাজকে ও শাসন-আইনকে বিশেষ শক্তিশালী করিবে। এরূপ স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেখিতে পাইবে অভারতীয় যে কোন সভ্যতাকেই ভারত নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই মুস্‌লিম্‌ সমস্যার জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি লুণ্ঠনবাদ্‌কে ভাঙ্গিয়া দিলে শুধু নমাজ পড়িয়া ও মসজিদ্‌ মেরামত করিয়া আর্যচিন্তার সাম্‌নে ইহা বেশীদিন দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি রাখে না। এই দার্শনিক ভিত্তিহীন মতবাদকে ভারতে স্থান করিয়া দিয়াছে পৌরোহিত্যবাদ। বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় রাজশক্তি এ দেশে রাজত্ব করিবার জন্য ইহাদের মধ্যে গুণ্ডামী নীতির প্রশ্রয় দিয়া ইহাকে এতদিন জীয়াইয়া রাখিয়াছে, নইলে ইহা বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতীয় সভ্যতায় অস্তমিত হইত। বর্ত্তমান ভারত-শাসন-আইনও যদি গান্ধীবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের অদূরদর্শিতার জন্য কোন বিরূপ রূপ লাভ না করে তবে শক্তিবাদ উহার মধ্য দিয়াই এমন শক্তি লাভ করিতে পারিবে যাহাতে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির পথ সহজ করিতে পারিবে।

শক্তিবাদকে চিন্তাজগতের লড়াই জানিবে। চিন্তা-জগতের এই শক্তিশালী শক্তির সহিত জড়-শক্তি মিলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদি দেশে শোষণবাদ. গুণ্ডামীবাদ ও নারীহরণবাদের অস্তিত্ব থাকে এবং পৌরোহিত্যবাদের পীড়নের প্রভাব থাকে তবে শক্তিবাদ এ দেশে সহজেই নিজের আসন করিতে পারিবে।

৯১। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সবচেয়ে মেধাসম্পন্ন, চরিত্রবান্‌ ও স্বাস্থ্যবান্‌ স্বদেশবাসীকে সরকারীপদে গ্রহণ করিবার নীতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার নীতির অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ করিবে। সরকারী কার্য্য অনুপযুক্ত লোক দ্বারা কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কোন সম্প্রদায়কে এরূপে সামান্য প্রশ্রয়ও সমর্থন করিবে না। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিবাদ বহু মুখে প্রবাহিত হইবার পথ পাইবে এবং ভারত-শাসন-আইন অচল হইবে; অথবা দেশের শাসনশক্তি অনুপযুক্ত লোকের হাতে গিয়া পড়িবে। এই ব্যাপারে গান্ধীবাদের ফল স্বরূপ প্যাক্টবাদীরা যে অনলে ইন্ধন দিয়াছে উহা দ্বারা লুণ্ঠনবাদ ও বৈদেশিক শোষণবাদকে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

৯২। শক্তিবাদে হিন্দু, মুসলমান, ঈশাই, বা উচ্চনীচের প্রশ্ন নাই। ইহাতে আছে মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের আস্থরিকতা, দুর্ব্বলতা ও পূর্ণশক্তিমত্তা নামক ত্রিবিধ দিকের চিন্তা-ধারা ও কর্ম্মবিজ্ঞান। মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের দুর্ব্বলতা টুকু কাটিয়া গেলে যে টুকু বাকী থাকে উহার নাম 'আস্থরিকতা ও শক্তিবাদের সংঘর্ষ'। বৃটেন এবং দেশের এক শ্রেণীর নেতাগণ যদি শক্তিবাদীদিগকে এরূপ সংঘর্ষের সুযোগ দেয় তবে এই সংঘর্ষই ভারতকে শক্তিশালী ও মুক্ত করিবে। হিন্দু-মুসলমান মিলন বা বিচ্ছেদ বলিয়া কোন কথাই শক্তিবাদে উঠে না, এখানে মানুষ সব সমান; এখানে সংঘর্ষ কেবল দেবতায় ও অস্থরে। কাজেই হিন্দু-মুসলমান মিলন-বৈঠকের জন্য যাঁহারা ব্যস্ত সেইসব ভদ্রলোকগণকে দেশের মঙ্গলের পক্ষে সয়তানের মত বিপজ্জনক জানিবে। অতীতে মুসলমান সমাজের একটা বৃহৎ অংশ যেরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছে

তাহাতে শক্তিবাদীরা হিন্দুগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শক্তিবাদী প্রস্তুত করিয়া না লইলে অত্যন্ত ভুল হইবে। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক শাসনের আমলে অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শবাদে কাজে দিবে না। যতদিন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চলিবে ততদিন সাম্প্রদায়িক ভাবেই শক্তিবাদের ভিত্তি দিতে হইবে। যখন বাঁটোয়ারা সংশোধন হইবে তখন শক্তিবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার প্রলেপও প্রয়োজন হইবে না। শক্তিবাদ ব্যক্তিগত, সমাজগত বা দেশগত যে কোন গণ্ডিতেই একরূপ থাকে। গান্ধীবাদ, কংগ্রেসবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মত ইহাতে জাত যাওয়ার প্রশ্ন নেই। যাহাদের কর্ম্মনীতি আসুরিক নহে তাহাদের সঙ্গে শক্তিবাদের কখনও সংঘর্ষ হইবে না। দুর্ব্বলস্তরের কর্ম্মনীতিই আসুরিকতার প্রশ্রয়দাতা; এজন্য উহা শক্তিবাদীরা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে।

৯৩। কোন কর্ম্মকেই হেয় বলিয়া ধারণা করিবে না। কর্ম্ম মানুষকে অন্ন দেয় এবং অন্নই জীবন। অতএব কর্ম্ম মাত্রই শক্তিবাদীর জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও গ্রহণীয় বস্তু। যাহাতে যুবকগণ বেকার বসিয়া না থাকিয়া মজুরের কাজ, কুলির কাজ, কৃষকের কাজ, বিবাহের বাজনা, মন্দিরের বাজনা, চুলকাটা, কাপড় কাচা, সুতারের কাজ, খননের কাজ, রাজ মিস্ত্রীর কাজ, দপ্তরির কাজ, আতসবাজী প্রস্তুত করণ, মাছ ধরা, গাড়োয়ানের কাজ, জল তোলার কাজ, ঘরামীর কাজ, ঝালায়ের কাজ, জুতা প্রস্তুতকরণ, তরকারী বিক্রয় ইত্যাদি ছোট খাটো নানা প্রকার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে এজন্য সর্ব্বত্র সংগঠন দাঁড় করাইবে। মোটা কাজের মধ্য দিয়াই কোন সংগঠনের শক্তি ও প্রতিভা বেশী শক্তিশালী হয় ইহা মনে রাখিবে।

৯৪। দেশের প্রত্যেকটি বালক যাহাতে সুন্দর স্বাস্থ্য, সুশিক্ষা, সৎসাহস ও চরিত্রবল লাভ করিতে পারে এবং তাহারা যাহাতে সর্ব্বপ্রকার মোটা পাতলা কাজের উপযোগী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিতে পারে এজন্য সকলে সচেষ্ট হইবে। খেলা-ধুলার সঙ্গে প্রত্যেকটী যুবককে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। এসব যুবকগণ যাহাতে হাল্‌কা চিন্তায় অভ্যস্ত নেতাগণের প্ররোচনায় একরাত্রে স্বরাজ লাভের আশায় দুঃসাহসিক দুষ্কার্য্যে রত না হয় এজন্য সতর্ক করিয়া দিবে। বলা প্রয়োজন যুবকগণ লুণ্ঠনবাদীগণের অত্যাচারের সময় সমাজরক্ষায় সাহসিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করিবে ও সর্ব্বদা গুণ্ডার হাত হইতে নারীরক্ষায় যত্নশীল হইবে।

৯৫। মেয়েরা যুবকগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্য, চরিত্রবল, গুণ্ডা হইতে আত্মরক্ষায় সৎসাহস ও কৌশল শিক্ষা করিবে। সকলে বুদ্ধিমতী ও বিলাসিতাহীনা হইবে। নানা প্রকার কলাবিদ্যা ও গৃহশিক্ষায় সুশিক্ষা অর্জ্জন করিবে; কিছু কিছু চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা রাখিবে। বৃহত্তর জীবনের কথা ভাবিবে। দেখা যায় নারীরাই নারীদের সুখের বিশেষ বিরোধী হয়, কাজেই ঈর্ষা দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া পরস্পর পরস্পরের হিতৈষিণী হইবে।

৯৬। শক্তিবাদীরা গৃহে ও বাহিরে সর্ব্বত্র সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, কিন্তু আসুরিকতা, গুণ্ডামী ও দুর্ব্বলচিন্তার বিরুদ্ধে একটু শক্ত হইবে। একটী লোককেও প্রস্তুত করিবার জন্য অসীম ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে। অন্যায় ও অবিচার না দেখিলে বিনা কারণে কেন্দ্রীয়-শাসন-তন্ত্রকে কখনও বিব্রত করিবে না।

১৯৩৯ সালের যুদ্ধ ও শক্তিবাদ

এই বৎসরের ত্রিপুরা কংগ্রেসের পূর্ব্বে আমাদের এই "শক্তিবাদ" লেখা হইয়াছিল। এই অত্যল্পসময়ের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ও ভারতীয় চিন্তায় বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই যুদ্ধ ব্যাপারে ভারতবাসী রাজনীতি ক্ষেত্রে যে শিক্ষা লাভ করিবে তাহাতে ভারতের চিন্তায় এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। ইউরোপের যুদ্ধ যে এত শীঘ্র আরম্ভ হইবে ইহা ধারণা করা যায় নাই। কারণ বৃটেনের নীতি জার্ম্মানীকে খুসী করিবার অনুকূলেই ছিল। জার্ম্মানীর লক্ষ্য ছিল ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটী (ইটালী ও ফরাসী) শক্তিশালী জাতির সহায়তায় বৃটিশের সর্ব্বনাশ করা। জার্ম্মানী সেই চেষ্টায় ফরাসীকে বহুদিন হইতে নিজের দলে পাইবার চেষ্টা করিতে ছিল। জার্ম্মানী এই লক্ষ্যে কিছুটা যে অগ্রসর হইতে ছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফলতঃ বৃটেনের যদি ফ্রান্সের বন্ধুত্বে বিশ্বাস অটুট আছে বলিয়া মানা যায় তবে বৃটেনের এতশীঘ্র এই যুদ্ধে নামিয়া পড়িবার কোনই কারণ থাকে না। বাস্তবিক ইহা ভিন্ন বৃটেনের যুদ্ধে নামিবার কোনই কারণ নাই। এই যুদ্ধে বৃটেনকে বেশী ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, ইহা কিন্তু তাহারাও জানে। এই যুদ্ধে এপর্য্যন্ত বৃটেন খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত আত্মশক্তি রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার নীতি ধরিয়াছে, কিন্তু তবুও ফল কি হইবে বলা যায় না। ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক স্থিতি কোন্ ভাবে কখন পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন্ পক্ষে সর্ব্বনাশ করিবে ইহা বলা বড় কঠিন। এ যুদ্ধকে যিনি যে ভাবেই দেখুন না কেন ইহা যে স্বার্থের সঙ্ঘাত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে ইহা দুইটী আসুরিক শক্তির টক্কর ভিন্ন ইহাতে বুঝিবার আর কিছুই নাই। বৃটেন যতদিন ভারত হইতে তাহার শোষণনীতি ঢিলা করিয়া দেয় নাই ততদিন ভারতবাসী যে বৃটেনকে বড় আদর্শবাদী ও উদার দেশ বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা আশা করা বৃথা। এই উপলক্ষ্যে কংগ্রসশাসিত প্রদেশে নিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহ (অসহযোগ) ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার পরিণতিতে ভারতের যে কোন সুবিধা হইবে ইহা এখনও বিশ্বাস করা যায় না বরং হিন্দুদের শক্তিখর্ব্বতার আরও একটা অধ্যায়ের সূত্রপাত করা হইল। অবশ্যই ইংরেজের বিপদটা আরও ঘনীভূত হইলে ইংরেজ সুর নরম করিবে; কারণ দেশের চিন্তা গান্ধিবাদ হইতে বদলাইয়া যাইতেছে। এই গান্ধীবাদী বিদ্রোহ যদি আরো অগ্রসর না হয় তবেই মঙ্গল, নইলে ইহার ফলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই সময় গান্ধিবাদী কর্ত্তৃপক্ষ পদত্যাগ না করিয়া অন্য কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলে ভাল হইত। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুস্‌লিম্ গুণ্ডামী বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গান্ধীবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নেতারা আজ পর্য্যন্ত ইহার

প্রতিকার করিবার কোন পথ আবিষ্কার করে নাই। কাজেই এ সময় নেতারা সাবধান হইয়া ব্যাপক বিদ্রোহের ইন্ধন না দিলেই ভাল হইবে। মহাসভার চিন্তা শক্তিহীন থাকা পর্য্যন্ত দেশ যে কোনও প্রকার বিদ্রোহ করিতে গড়িয়া উঠে নাই, ইহা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝিতে পারেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসর কিরূপ ব্যর্থ কর্ম্মনিষ্ঠায় আমাদের জাতির মন আচ্ছন্ন ছিল তাহার প্রমাণ এই যুদ্ধ করিয়া দিবে। কংগ্রেস যে জাগরণ দেশে আনিয়াছে বলিয়া দাবী করে উহা যুগের জাগরণ; উহাতে কংগ্রেসের কোনও কৃতিত্ব নাই। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসর, বিশেষ করিয়া বিগত বিশ বৎসর যেরূপ অদূরদর্শিতার সহিত কংগ্রেসের নেতারা দেশকে ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করিয়াছেন চিন্তাশীলদের নিকট উহার ক্ষমা নাই। যতদিন গান্ধীবাদ ও সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ নিল্প্রভ হইতেছে না এবং শক্তিশালী চিন্তা দৃঢ় ভিত্তি লইতেছে না ততদিন দেশে বিদ্রোহ আনা ও আত্মহত্যার অনুষ্ঠান এক জানিতে হইবে। এই মহাযুদ্ধ উপলক্ষ্যে আমরা বিলাতের দপ্তর হইতে যে সব ঘোষণার বাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই বুঝা যায় ভারত এ যুদ্ধে বিশেষ কিছুই পাইবে না। বৃটিশ জানে ভারতের নেতারা ভারতকে বহুদিনের জন্য শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। মুস্‌লিম্‌ লীগের অত্যন্ত স্বার্থপরতা, গান্ধীবাদীদের হিন্দুস্বার্থ খর্ব্ব করিয়া মুস্‌লিম্‌ পূজা, সোশিয়েলিষ্টদের গান্ধীবাদীগণকে এ অপচেষ্টায় সমর্থন এবং সোশিয়েলিজমের শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা স্বাধীনতার প্রধান সমর্থক হিন্দুসমাজকে দুইটা বিভিন্ন চিন্তায় বিচ্ছিন্ন করণরূপ অপকার্য্য ভারতকে এই সুযোগে হীনবল করিবার ইন্ধন দিয়াছে। এই সময় কংগ্রস বিদ্রোহ বাধাইলেও শক্তিবাদ তাহার উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে এবং বিদ্রোহ না বাধাইলেও গান্ধীবাদীকংগ্রেস তাহার প্রতিষ্ঠা হারাইয়া শক্তিবাদের জন্য পথ করিয়া দিবে। ১৯৩৯ সনের এই ইউরোপীয় যুদ্ধ যে ভারতের চিন্তাজগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিবে দেশবাসী ক্রমেই উহা বুঝিতে পারিবে। যদি শক্তিশালী না হইয়া এই সময় কংগ্রেস ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করে তবে ইহার ফলে গুণ্ডামীর ঠিকেদারগণও যে নিজেদের কুকর্ম্ম আরম্ভ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত। শক্তিবাদীদের কর্ত্তব্য হইবে গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে নারী ও শিশুগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং গান্ধীবাদী কংগ্রেসের সংঘর্ষ হইতে সাবধানে দূরে থাকা। যে সমাজ এ ভারতের বুকে লুটতরাজ, নারীর অপমান ও শিশুহত্যার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের উপর আমাদের ঘৃণা যে কত গভীর উহার চিহ্ন ভারতের গৌরবের দিনের ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। আজ যে সাম্প্রদায়িক ঝগড়া সৃষ্ট হইয়া ভারতের হাওয়া বিষাক্ত করিতেছে উহা শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে ইহা সত্য, কিন্তু ইতিহাসের পাতা এ গুণ্ডামির কলঙ্ক যুগযুগান্তর বহন করিবে। যে গান্ধিবাদ এই অনীতির ইন্ধন দিয়াছে তাহারও স্মৃতি ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাবে না। এই মহাযুদ্ধ যদি দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তবে শক্তিবাদ ভারতের জন্য অমৃতের কাজ করিবে।

রুষের ভারত আক্রমণ (?)

অনেকের অনুমান যে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া রুষ ভারতকে আক্রমণ করিবে। সেই সময় ভারতের কি কর্ত্তব্য হইতে পারে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। রুষের রাজ্যবিস্তারলিপ্সা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতছে এবং বৃটেনের অধীনস্থ ভারত যেরূপভাবে শোষিত ও শাসনোদ্ভব অন্তর্কলহে জর্জ্জরিত হইতেছে এরূপ অবস্থায় রুষের ভারত আক্রমণ এবং একদল শক্তিশালী অংশ ভারতবাসীর রুষের অনুগমন অস্বাভাবিক নহে। এরূপ সময়ে শক্তিবাদীরা কি করিবে ইহা খুব চিন্তনীয় বিষয়। কোন দেশেই ধনসাম্যবাদ স্থাপিত হইতে পারে না। রুষেও উহা স্থাপিত নাই, কিন্তু রুষ রাজ্যবিস্তারের জন্য গরীব, কৃষক ও মধ্যবিত্তের এক বড় অংশকে হাতে পাইবার একটা শক্তিশালী কর্ম্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসন কখনও সোশিয়ালিষ্ট কর্ম্মবিজ্ঞানে চলিতে পারে না। রুষ রাষ্ট্র-নায়কগণ এই স্বাভাবিক সত্য জানেন এবং নিজেদের শাসন-নীতিকে 'ট্র্যানজিটারী ষ্টেজ' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃত সত্যকে ঢাকা দিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও রুষ দেশে গভর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধ ভীষণ শক্তিশালী একটা খাঁটী সোশিয়েলিষ্ট পন্থীর অস্তিত্ব ছিল। প্রতি বৎসর এই সঙ্ঘের সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুদণ্ড হইত। রুষের রাজ্যবিস্তারের কার্য্য আরম্ভ হইবার পর এ দলের কার্য্যকলাপ স্বভাবতঃই নিল্প্রভ হইতে বাধ্য, কারণ যে সব জাতি শক্তিস্তরের চিন্তার সন্ধান রাখে না তাহাদের জন্য অন্য জাতির উপর আধিপত্য করিবার লোভ থাকা স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য ইহা আসুরিক মনোবৃত্তিরই লক্ষণ।

সোশিয়ালিজমের একটা মজার বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোন শাসনতন্ত্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী এই নামধারী একটা দলের স্থাপনা যে কোন দেশেই হইতে পারে। অবশ্যই বহু সাম্রাজ্যশোষক এ শাসক ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে ইহাদের অস্তিত্বের কোন কার্য্যকরী প্রয়োজনীয়তা নাই; যতক্ষণ ইহারা এসেম্ব্রিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকে ততক্ষণ ইহারা শাসন-নীতির তীব্র বিরোধী হয়। ইহারা যখন সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয় তখন ইহাদের নেতা বাগাড়ম্বরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া নিজের দলের একটা বড় অংশ লইয়া এক মুহূর্ত্তে রক্ষণশীলদলে ভিড়িয়া যান। রুষ রাজ্যবিস্তারে মন দিবার পর ঐ দেশের শাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী খাঁটী সোশিয়ালিষ্টরাও একদিন ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশের সোশিয়ালিষ্ট পন্থীদের মত মনোবৃত্তি লাভ করিবে। সাম্রাজ্যবাদীদের দেশে সোশিয়ালিষ্ট দলের অস্তিত্ব ইহাদের অধীনস্থ দেশের একদল যুবকের জন্য আলেয়ার মত বিপজ্জনক। এই আলেয়া অধীনস্থ সাম্রাজ্যে জাতীয় চিন্তাকে দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ভাগ করিয়া ঐ দেশের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দেশকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য যে বিদ্যমান্ উহা শক্তিবাদীরা জানিয়া রাখিবেন। ভারতে সোশিয়ালিষ্টগণের অস্তিত্ব থাকিবার বহু কারণ বিদ্যমান। ইহাতে আমাদের দেশের নেতারাই দোষী নহেন। এই ব্যাপারে ইংলণ্ড, ফরাসী, রুষ সকলে অল্পাধিক ব্যয় করিয়া নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতেই যত্নশীল।

রুষের রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যশাসনের নীতির সহিত ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের আদর্শের ভেদ আছে। রুষ রাজ্য বিস্তার করিয়া উহাকে আশ্রিত রাজ্য

করিয়া রাখে। ইংলণ্ড হস্তগত রাজ্যকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া শোষণ করিয়া সেই জাতিকে নিষ্প্রভ করিয়া বাঁচাইয়া রাখে। রুষ রাজ্যবিস্তার করিয়া অধিকৃত দেশের স্বাধীন ও সতেজ অংশকে বুর্জ্জুয়াদের দলে ফেলে ও তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সে দেশের মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশকে হাতে করিয়া দেশের প্রভুত্ব নিজেদের হাতে করিয়া লয়। শক্তিবাদীরা রুষের এই নীতিকে ঘৃণা করে। এই নীতির বলে রুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে কোন উন্নত সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত দেশকে অধীন করিয়া রাখিতে সমর্থ। শোষণবাদ হইতে এই শিরচ্ছেদ-নীতি কম বিপজ্জনক নহে। একটা জাতির মধ্য হইতে সাহসী, ত্যাগী, ধীর ও উন্নত চিন্তায় অভ্যস্তগণকে ধ্বংস করিয়া সেই জাতির মধ্যস্থিত পশুস্তরের মানুষের রক্ষা দ্বারা রাজত্ব করার নীতিকে আমরা কি বলিব? রুষের রাষ্ট্রনীতি ও সোশিয়েলিষ্ট নীতি এক নহে, ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি; কিন্তু রুষ-রাষ্ট্রনায়কদের বহু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজের প্রভুত্বশক্তির বৃদ্ধিকে বর্ত্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিকগণের সাম্রাজ্য বিস্তারের সহিত তুল্যভাবে তুলনীয় না হইলেও মধ্যযুগের প্রভুত্ববাদী সম্রাটগণের নীতির সহিত উহা তুল্য পরিমাণ তুলনীয় ও নিন্দনীয়। ভারতের উপর লুণ্ঠনবাদ ও শোষণবাদ কি ভাবে আধিপত্য জমাইয়া বসিয়াছে, ইহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। রুষের রাজ্যবিস্তারের সীমা ভারতসীমা অতিক্রম করিলে উহার ফলে ভারতের উন্নত চিন্তা ও আদর্শের সহিত একটা ভীষণ টক্কর আসিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ইহাতে রুষকে ভারতে ডাকিয়া আনা অপেক্ষা আমাদের মতে শক্তিবাদের আশ্রয়ে লুণ্ঠনবাদকে শেষ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া শোষণবাদকে উচ্ছেদ করা সহজ ও সঙ্গত হইবে।

রুষ যদি ভারত অধিকার করিয়া লয় এবং রুষের যদি নিজের সোশিয়েলিষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপর সামান্যও আস্থা থাকে তবে রুষের নীতি নিশ্চয় ভারতের শক্তিবাদের নিকট পরাজিত হইবে। ফলে কেবল ভারতেই শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, রুষেও শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু মানুষের প্রভুত্বের লোভ এবং অল্পবুদ্ধিমান্‌দের দলমোহ অত্যন্ত বিপজ্জনক বস্তু। কাজেই আমাদের দেশের সোশিয়েলিষ্ট পন্থীরা দলমোহে রুষের রাষ্ট্রনায়কদের প্রভুত্বের সহায়ক যে হইবে না, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? মুসলমানেরা জাতিতে ও রক্তে হিন্দু হইয়া আজ দলমোহে ভারতের কিরূপ সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। রুষের অর্থব্যবস্থা এমনই শক্তিশালী যে রুষ নিজের প্রতিকূল যে কোন দলকে অনাহারে মারিয়া ফেলিতে সক্ষম।

রুষ আক্রমণে ভারতের একটা শক্তিশালী অংশ যদি রুষের অনুকূল হইবার লক্ষণ দেখা যায় তবে রুষের আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব হইবে। ইংলণ্ডের শোষণশৃঙ্খল যদি ইহার পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া যায় তবে শক্তিবাদ আশা করে যে রুষ আক্রমণে ভারতের কোন শক্তিশালী অংশ রুষের অনুকূল হইবে না। ভারত ইংলণ্ডের শোষণজাল হইতে মুক্ত হইবার পর রুষ দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে সময়ও যদি দেখা যায় কোন একটা অংশ রুষের অনুকূলে দাঁড়াইয়াছে তখন শক্তিবাদীর কর্ত্তব্য হইবে ঐ সব যুবকদের জন্য কঠোর নীতির সমর্থক হওয়া এবং সম্মিলিতভাবে রুষের আক্রমণকে বাধা দেওয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংলণ্ড যদি শোষণ-শৃঙ্খল ভারত হইতে খুলিয়া লয় তবে শক্তিবাদী ভারত ইংলণ্ডের মিত্রতা-সূত্রে ও সম্রাটের অধীনতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও শক্তিবাদের

বিচারে ভারতের স্বাধীনতার কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না। ইংলণ্ডও ভারতের সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকিলে ইংলণ্ডের পরম কল্যাণ হইবে। এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে ইংলণ্ডের সামরিক শক্তি ও কৌশল ভারতের পিছনে না থাকিলে নিরস্ত্রীকৃত ভারত আভ্যন্তরীণ কর্ম্মনীতি বিজ্ঞানে এক হইলেও রুষের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে না। ভারতের জাতীয় চিন্তা যাহাতে দুইভাগে ভাগ হইয়া না যায়, ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব যাহাতে বিদেশীর হস্তগত না হইয়া ভারতীয়ের হাতেই থাকে এবং ভারতের চিন্তাশীলগণকে বুর্জ্জুয়াদলে ফেলিয়া শিরচ্ছেদের নীতি যাহাতে যুগযুগান্তরের জন্য স্থাপিত হিতে না পারে, এ সব দিক বিচার করিয়া শক্তিবাদীরা কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবেন। দেশকে অজ্ঞাতকুলশীল রুষের হাতে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের শোষণ-জাল ছিন্ন করা সহজ বলিয়া আমাদের মনে হয়। শক্তিবাদীরা জানিয়া বুঝিয়া কিছুতেই দেশের ক্ষতি করিবে না; কিন্তু সবটাই নির্ভর করে ইংরেজের ব্যবহারের উপর। দীর্ঘ যুদ্ধে ভারতের চিন্তা শক্তিশালী হইতে সময় পাইবে এবং অসন্তুষ্ট ভারতই বৃটেনের প্রতিকূলে যাইতে উৎসাহ পাইবে।

যুদ্ধের আরম্ভে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা

মহাযুদ্ধের ৪ মাস কাটিয়া গিয়াছে। জানুয়ারী (১৯৪০) যুদ্ধের পঞ্চম মাস। এই চারমাস ভারত অনেক কিছু শিখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার উপাসকগণ তিনটা শক্তিশালী দলে বিভক্ত - গান্ধিবাদী, বামপন্থী ও মহাসভাপন্থী। ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে বিলাতের রক্ষণশীল দল ও এদেশের লীগপন্থীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার উপাসকগণের এই দুইএর কর্ম্মনীতি ও চিন্তাধারা সন্দেহের চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য। স্বাধীনতার উপাসক দলগুলির চিন্তা-বিজ্ঞান ও কর্ম্মধারা বিভিন্ন প্রকারের হইলেও ইঁহারা স্বাধীনতার বিশ্বস্ত উপাসক বলিয়া ইঁহাদের কার্য্যধারা একমুখে প্রবাহিত হইতে বাধ্য। আমরা গান্ধিবাদিগণকে শীঘ্র মুস্‌লিম্ তোষণনীতি ও বামপন্থীগণকে শ্রেণী-বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে বলিতেছি। মহাসভা বৃটেনের অনুকূলে থাকিয়া সঙ্ঘবদ্ধ থাকিতে চায় দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে পছন্দ করে না। কিন্তু মহাসভা এই সময় এইরূপ নীতি গ্রহণ করিয়া খুব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। মহাসভা শক্তিশালী না হইলে কেবল মুস্‌লিম্ গুণ্ডামী দ্বারাই ৫০ বৎসর ভারতের মুক্তি ঠেকাইয়া রাখা যাইবে। লীগপন্থীরা চায় হিন্দুরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করুক এবং উহার ফলটা মুসলমানেরা ভোগ করুক। যদি ভারতে সরিয়তের শাসনই স্থাপন না হয় তবে ইহারা বৃটেনের শাসনকে কায়েম রাখিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে। এই জন্যই বোধ হয় 'সরিয়ৎ' তুরস্ক বীরের অপ্রিয় হইয়াছিল। ইহারা গান্ধিবাদিগণকে যেরূপ গুণ্ডামির চাপে দাবাইয়া রাখিতে চায়, মহাসভাকে সেই ভাবে দাবান যাইবে না। ইহারা হিন্দুগণকে যতটা ভীরু ও সঙ্ঘবদ্ধহীন মনে করে, হিন্দুরা কিন্তু ততটা ভীরু ও সঙ্ঘবদ্ধহীন নয়। মুসলমানদের শাসন সভ্য সমাজের জন্য যে কতটা অযোগ্য উহার প্রমাণ বাংলার হক্ মিনিষ্ট্রীর আইনের খাতাতে লিপিবদ্ধ আছে। হক্ মিনিষ্ট্রীর শাসনের

যুগে এসেম্‌ব্লির অধিবেশনগুলি পড়িলে মনে হইবে উহা আইন সভা নহে; উহা হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামীর মন্ত্রণার আড্ডা। এই গুণ্ডামীতে দক্ষিণ ও বামপন্থী কংগ্রসও যথেষ্ট ইন্ধন দিয়াছে। বিলাতের রক্ষণশীলদের সমর্থক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি পড়িলে ইহাই বুঝা যায় যে, একটা শক্তিশালী ষড়যন্ত্র সমস্ত ভারত জুড়িয়া লীগপন্থী ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চলিয়াছে। এই পত্রিকাগুলি নির্লজ্জের মত মুস্‌লিম্‌ অনীতির প্রশ্রয় দেয় এবং হিন্দুগণকে গান্ধিবাদের মোহে ফেলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া দাবাইতে চায়। সব অনীতিরই সীমা হইবে, যদি ভারত শক্তিবাদ বুঝিতে পারে। এই ভাবে ভারতের স্বাদীনতা ঠেকাইয়া, ইংরেজও যে মহাযুদ্ধ অতিক্রম করিয়া আস্ত বাহির হইয়া আসিবে, ইহাতে সন্দেহ আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যে ইংরেজেরই অনীতির পরিণতি, উহা ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন। শক্তিবাদ গান্ধিবাদী, বামপন্থী ও মহাসভাপন্থিগণকে শক্তিশালী ও এক করুক এবং মহাসমর দীর্ঘজীবী হউক, তবেই প্রকৃতি অনেক কিছুর মীমাংসার সহায়ক হইবে।